দা'য়ীর সাথে আল্লাহ তা'আলা আছেন

মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.

জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেটে শিক্ষা অর্জনকারী ফুযালায়ে কেরামের সমন্বয়ে গঠিত সংগঠন রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়ার বার্ষিক সম্মেলন-২০১৬ এ উপস্থিত ফুযালায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সমাপনী বয়ানের সারসংক্ষেপ।

হামদ ও সালাতের পর...

আহলে ইলমের ওয়াদা

রূহের জগতে আল্লাহ তা'আলা সাধারণ লোকদের ওয়াদা নিয়ে তাদের থেকে পরওয়ারদিগারের প্রভুত্বের স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন। ইরশাদ হয়েছে,

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا.

অর্থ : হে রাসূল! লোকদেরকে স্মরণ করিয়ে দিন ঐ সময়ের কথা, যখন আপনার প্রতিপালক আদম সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের সন্তানদেরকে বের করেছিলেন এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের সম্পর্কে সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি কি তোমাদের রব নই? সকলে বলেছিলো, অবশ্যই, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমরা আপনাকে রব হিসেবে স্বীকার করি। (সূরা আরাফ- ১৭২)

এই ওয়াদা ছাড়াও আল্লাহ তা'আলা আম্বিয়ায়ে কেরাম থেকে ভিন্ন একটা ওয়াদা নিয়েছিলেন।

'আমি তোমাদেরকে রাসূল বানাতে চাই। তবে তোমাদের অনেক কুরবানী পেশ করতে হবে। অনেক ঝক্কি-ঝামেলা পোহাতে হবে। অনেক ফিতনা মোকাবেলা করতে হবে। তোমরা কি এর জন্য রাজি আছো? সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম বলেছিলেন, দীনের জন্য কুরবানী করতে আমরা রাজি আছি।' (সূরা আলে ইমরান- ৮১)

এই আয়াতটিতে আম্বিয়ায়ে কেরামের সাথে ওয়ারাসায়ে আম্বিয়াও অন্তর্ভুক্ত। ওয়ারিসে নবী হওয়ার কারণে নবীর দায়িত্ব তাদেরও দায়িত্ব। আল্লাহ তা'আলা যে নবীদের সাথে সাথে ওয়ারাসায়ে আম্বিয়া থেকেও আলাদাভাবে ওয়াদা নিয়েছেন তা এই আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়,

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ.

অর্থ : স্মরণ করো ঐ সময়ের কথা, যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আহলে ইলমদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তোমরা আমার কিতাব খুলে খুলে বয়ান করবে এবং গোপন করবে না। (সূরা আলে ইমরান- ১৮৭)

অনেক আলেম নিজেদের চাকরি-ইমামতি বাঁচানোর জন্য মাসআলা বা হক কথা বলতে সাহস পায় না। তারা এই আয়াত অনুযায়ী 'কিতমানে ইলম' তথা সত্য গোপন করছে। যার ভয়াবহ পরিণামের ঘোষণায় অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ.

অর্থ : আমি আমার নাযিলকৃত কিতাবে মানুষের জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণাদী ও হিদায়াতের কথা খুলে খুলে বর্ণনা করা সত্ত্বেও যে সকল আলেম তা গোপন করে, নিশ্চয় তাদের উপর আল্লাহর লা'নত, নবীগণের লা'নত, ফেরেশতাগণের লা'নত এবং অন্য সকল লা'নতকারীর লা'নত। (সূরা বাকারা- ১৫৯)

আমরা কি লা'নতের ভাগীদার হতে আলেম হয়েছি? কাজেই আমাদের প্রত্যেকের বুকে হক কথা বলা ও বাস্তব সত্য প্রকাশের হিম্মত এবং সৎসাহস অবশ্যই থাকতে হবে।

দা'য়ীর কথার বৈশিষ্ট্য

আমাদের আকাবিরগণ বলেছেন, দা'য়ীর কথায় তিনটা হক একত্রিত হওয়া অপরিহার্য। হক নিয়তে হক তরীকায় হক কথা বলতে হবে। যদি এই তিনটি শর্ত একত্রিত হয় তবে সে দা'য়ীর কথায় ফিতনার উৎপত্তি হবে না। ফিতনা নির্মূল হবে। তবে শর্ত হল, তিনটি হক একত্রিত হতে হবে। নিয়ত হক তথা খালেস হতে হবে এবং কথা বা বক্তব্যও হক হতে হবে। আর তরীকা হক হওয়ার উদ্দেশ্য হলো, কোনো ব্যক্তিবিশেষকে ঘায়েল করে প্রতিপক্ষ না বানিয়ে, দরদী মনে ব্যাপকভাবে সকলকে সম্বোধন করা।

অনেক সময় এমন হয়, আমাদের পাশে কোনো দাড়ি কাটা লোক থাকে। তখন একজন হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে, হুযূর! দাড়ির হুকুম কী? রাখতে হবে, নাকি কাটতে হবে? এ ধরনের প্রশ্নের উদ্দেশ্যই হলো ঐ লোকটাকে ঘায়েল করা। ঘায়েল করে কথা বললে হিদায়াত আসবে না। বরং ফিতনা হবে। এজন্য কথা বলার তরীকা জানতে হবে এবং শিখতে হবে।

কথা বলার তরীকা শিখানোর জন্যই ছাত্রদেরকে জোর করে হলেও তাবলীগে পাঠানো হয়। তখন বুঝে না আসলেও পরে খিদমতে লাগার পর তাদের বুঝে আসে, কেন তাদের ওখানে পাঠানো হয়েছিলো।

নেক কাজে জবরদস্তি

নেক কাজে কোনো 'ইজবার' (জবরদস্তি) নেই– একথার অর্থ এটা নয় যে, নেক কাজের জন্য জবরদস্তি করা যাবে না। এর অর্থ হলো, নেক কাজে জোর-জবরদস্তি করা হলেও শরীয়তে সেটা 'ইজবার' বা জবরদস্তি হিসেবে গণ্য হয় না।

বুখারী শরীফের 'কিতাবুত তাফসীরে' كنتم خير أمة (অর্থ : তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। সূরা আলে ইমরান- ১১০) এর তাফসীরে হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. এর বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, 'তোমাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত সাব্যস্ত করার কারণ হলো, যারা জান্নাতে যেতে রাজি নেই তাদেরকে তোমরা শিকলবন্দী করে জান্নাতে নিয়ে যাবে।' যুদ্ধশেষে যেসব কাফেরদের শিকলবন্দী করে আনার পর পরবর্তীতে তারা মুসলমান হয়ে যায়, তারা এই হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। শিকলবন্দী করে আনার কারণেই তারা জান্নাতের পথিক হতে পেরেছে। তাবলীগের সাথীরা মানুষকে নামাযী বানানোর জন্য, হিদায়াতের পথে আনার জন্য বারবার তাদের দুয়ারে যায়। লাঞ্ছিত-অপমানিত করার পরও যায়। এরপর মানুষটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও যখন মসজিদে এসে তাদের কথাবার্তা শোনে ও আচার আচরণ দেখে তখন সে চিল্লার জন্যও নাম লেখায়। এমনকি তিনচিল্লাও দেয়। দা'য়ীর মনের ব্যথা আর আচরণের নম্রতার কারণে এভাবে অনেক

মানুষ হিদায়াত পেয়ে যায়। শুরুতে তাবলীগের সাথীরা পীড়াপীড়ি করার কারণেই শেষ পর্যন্ত মানুষগুলো জান্নাতী পথের পথিক বনে যায়।

ছাত্রদেরকে জোরপূর্বক তাবলীগে পাঠানোর কারণেই ফারাগাতের পর তারা দাওয়াতের মেহনত হক তরীকা অনুযায়ী কাজ করতে পারে। অন্যথায় এই তরীকাগুলো শেখা না থাকলে পদে পদে হোঁচট খেতে হতো। জানতোড় মেহনত করা সত্ত্বেও কোনো ফলই আসতো না। এমনকি তরীকা না জানার কারণে মানুষ হিদায়াত পাওয়ার পরিবর্তে আরো গোমরাহ হতো। এই অবস্থা থেকে বাঁচানোর জন্যই আসাতিযায়ে কেরাম ছাত্রদেরকে জোর করে হলেও তাবলীগে পাঠিয়ে থাকেন।

বিধর্মীদের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা

উপরোক্ত হাদীস থেকে বোঝা গেলো যে, বিধর্মীদের জন্যও আমাদের অন্তরে দয়া এবং দরদ থাকতে হবে। তাদের জন্য বদদু'আ নয়; হিদায়াতের দু'আ আসতে হবে এবং এর জন্য চেষ্টা-মেহনতও করতে হবে। কেননা যে কোনো মানুষ চাই সে মুসলিম হোক বা অমুসলিম, সবার বাবা-মা এক। সকলেই হযরত আদম আ. এর সন্তান। আমরা যে নবীর উম্মত তারাও সেই নবীরই উম্মত। একই বাবা-মায়ের ঘরের আপন ভাই-বোন খারাপ পথে চললে অন্য ভাইদের উচিত তাকে ভালো পথে আনার আন্তরিক প্রচেষ্টা করা। হিন্দু বাবার ঘরে আগুন লেগে গেলে তা নিভাতে সব সন্তানের সাথে মুসলমান সন্তানও ঝাঁপিয়ে পড়বে। এটাই স্বাভাবিক দায়িত্ব। বিধর্মী বাবা-ভাই দুনিয়ার আগুনে জ্বলে-পুড়ে কষ্ট পাক– এটা যদি মেনে নেয়া না যায় তবে যে বিধর্মী ভাইগুলো জাহান্নামের দিকে ছুটছে তাদের বাঁচানোর জন্য অন্তরে দরদ থাকা কতটা বেশি জরুরী।

বিধর্মী কাফের মুশরিকদের জন্য নবীজী কতো কষ্ট বরদাশত করেছেন। নবীজীর দিলে তাদের জন্য কত বেশি দরদ ছিলো যে, নবীজীকে অতটা বেশি উৎকণ্ঠিত হতে বারণ করা হয়েছে। কুরআনে আয়াত নাযিল হয়েছে,

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ.

অর্থ : তারা ঈমান না আনার কারণে সম্ভবত আপনি নিজের জান বরবাদ করে দিবেন। (সূরা শু'আরা- ৩)

নবীজীর এমন অবস্থার বিপরীতে আমাদের হালাত হলো, বিধর্মীদের দাওয়াত দিতে এবং তাদের জন্য ফিকির করতেও আমরা প্রস্তুত নই। অথচ নায়েবে রাসূল হিসেবে আমাদের দিলের দরদ সবারই পাওনা; যেমন মুসলিম ভাই-বোনদের, তেমনি অমুসলিম ভাই-বোনদেরও। কাজেই মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবাইকে দাওয়াত দিতে হবে।

উম্মতের ত্রাণকর্তা উলামায়ে উম্মত : দুনিয়ায়ও আখিরাতেও

নবুওয়াতের ধারা শেষ হওয়ার পর কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম জাতির কর্ণধার হলেন আম্বিয়ায়ে কেরামের ওয়ারিস উলামায়ে কেরাম। এই উত্তরাধিকারের সূত্রে দুনিয়া এবং আখিরাতে জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর দায়িত্বও উলামায়ে উম্মতের।

হযরত ইউসুফ আ. নবুওয়ত লাভ করার পূর্বে মিশরবাসীকে দুর্ভিক্ষের কবল থেকে বাঁচিয়েছিলেন। মিশরবাসী তাঁর বাবা-ভাই বা আপনজন ছিলো না। মিশর তাঁর স্বদেশও ছিলো না। তাদের জন্য দিলে দরদ ছিলো বলেই বিপর্যয়ের হাত থেকে তাদেরকে বাঁচানোর জন্য তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন। মিশরবাসীদের অনাগত কষ্ট বরদাশত করতে না পেরে আগ বাড়িয়ে বাদশাহর কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলেন– 'রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্বভার আমাকে অর্পণ করুন'। (সূরা ইউসুফ- ৫৫)

কাজেই আম্বিয়ায়ে কেরামের ওয়ারিস হিসেবে উম্মতকে দুনিয়া এবং আখিরাতের সব ধরনের বিপদাপদ থেকে রক্ষা করা আলেমদেরই দায়িত্ব। আলেমরা কবীরা গুনাহের ক্ষতি বর্ণনা করে সতর্ক করতে থাকলে সমাজের মানুষ সচেতন হবে। গুনাহে কবীরার কারণে আখেরাতের ক্ষতির পাশাপাশি দুনিয়াবী বালা-মুসীবতেরও শিকার হতে হয়। আল্লাহ তা'আলা কাফেরদেরকে মুসলমানদের উপর আধিপত্য দিয়ে তাদের ঘরের ভেতর পর্যন্ত পৌঁছে দেন। ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদি সব ধরনের বিপদ-দুর্যোগে নিপতিত করেন। আলেমরা যদি মসজিদে মসজিদে এই বিষয়ে আলোচনা শুরু করেন তাহলে ধীরে ধীরে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা আসবে। আলেমদের তারগীবের ফলে কবীরা গুনাহ বর্জন করলে মানুষ দুনিয়াবী আযাব থেকেও বাঁচতে পারবে। মোটকথা, উলামায়ে কেরাম যথাযথভাবে তাদের যিম্মাদারী পালন করলে মানুষ আখেরাতের ক্ষতির পাশাপাশি দুনিয়াবী ক্ষতি থেকেও বেঁচে যাবে।

এই ক্ষতিগুলোর কথা মুসলমানরা জানে না। অথচ ইহুদী-খ্রিস্টান আর তাদের এজেন্ট এনজিও-মিশনারীরাও এগুলো বোঝে। তারা এভাবে মুসলমানদের মারাত্মক বিপদে ফেলার জন্য সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। তাদের সমস্ত চেষ্টা এবং পরিশ্রমের উদ্দেশ্যই হলো, কোন পন্থায় এবং কতো দ্রুততার সাথে মুসলমানদের ধ্বংস করা যায়। এর জন্য তারা মুসলমান নামধারী কিছু বিশ্বাসঘাতককে হাত করে তাদেরকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগাচ্ছে। অথচ মুসলমানরা না বুঝে তাদের এসব চক্রান্তের শিকার হয়ে একের পর এক মুসীবতে জড়াচ্ছে। এসব ষড়যন্ত্রের নীলনকশা মুসলিম জাতির সামনে খুলে খুলে বর্ণনা করা উলামায়ে উম্মতের দায়িত্ব। কাফেরদের চক্রান্ত থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করা উলামায়ে কেরামেরই যিম্মাদারী।

দা'য়ীর সাথে আল্লাহর নুসরত

দা'য়ীর মোকাবেলায় যেই আসুক কেউ তার ক্ষতি করতে পারবে না। বরং সে-ই ধ্বংস হবে। কারণ, দা'য়ীর সাথে আল্লাহ তা'আলা আছেন। ইস্তিকামাতওয়ালা দা'য়ী পাহাড়ের মতো; তার সাথে যে-ই টক্কর খাবে সে-ই টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

হযরত মূসা আ. ফিরআউনের পিছুধাওয়ার মুখে যখন সাগর পর্যন্ত এসে আটকা পড়লেন তখন তিনি বলেছিলেন, 'নিশ্চয় আমার সাথে রব আছেন। তিনি আমাকে পথের দিশা দিবেন' (সূরা শু'আরা- ৬২)। তিনি এভাবে বলেননি- 'আমাদের সাথে রব আছেন'। কারণ, তিনি ছাড়া তাঁর অনুসারী বনী ইসরাঈলের কেউ দা'য়ী ছিলো না। এর বিপরীতে আমাদের নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হিজরতের প্রাক্কালে 'গারে সাওর'-এ যখন কাফেরদের নজরে পড়ার আশঙ্কা হলো তখন তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের সাথে আল্লাহ আছেন' (সূরা তাওবা- ৪০)। কারণ, তাঁর সাথে তাঁর উম্মতকেও দা'য়ী বানানো হয়েছে। আর দা'য়ীর জন্য আল্লাহর নুসরত অনিবার্য।

কাজেই সকল ফিতনার মোকাবেলায় টিকে থাকতে হলে এবং জয়ী হতে হলে দা'য়ী হতে হবে। চাই তাবলীগের দা'য়ী হোক, বিধর্মীদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার দা'য়ী হোক কিংবা দাওয়াতুল হকের দা'য়ী হোক। যত কঠিন থেকে কঠিন ষড়যন্ত্রই হোক না কেন, সমস্ত ষড়যন্ত্র নিমিষেই ধূলিসাৎ করে দিতে তাঁর একটিমাত্র ইশারাই যথেষ্ট।

(৪৬ পৃষ্ঠায় দেখুন)

‘আমরাই যেন ইলম উঠে যাওয়ার কারণ হতে চাচ্ছি!’

আল্লামা হিফজুর রহমান মুমিনপুরী দা.বা.

জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেটে শিক্ষা অর্জনকারী ফুযালায়ে কেরামের সমন্বয়ে গঠিত সংগঠন রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়ার বার্ষিক সম্মেলন-২০১৬ এ উপস্থিত ফুযালায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত উদ্বোধনী বয়ানের সারসংক্ষেপ।

হামদ ও সালাতের পর...

ইলমে দীনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা

তোমাদের সঙ্গে জামি'আর সম্পর্ক সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে দামী নেয়ামতের অধিকারী হওয়ার সূত্রে। আমাদের সঙ্গে তোমাদের মুহাব্বত ইলমে নববীর কারণে, যা মুসলিম জাতির জন্য ঈমান ও ইসলামের পরে সবচেয়ে দামী সম্পদ। মূলত ইলমে নববী এমন অমূল্য সম্পদ, যার মাধ্যমে মানুষ অন্যান্য সকল প্রাণী ও পশুপাখির উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. কে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করা হয়েছিলো। প্রথম প্রশ্নটি ছিলো, প্রকৃত মানুষ কে? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, প্রকৃত অর্থে মানুষ হলেন ইলমে নববীর ধারক বাহকগণ। দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল, আসল বাদশাহ কারা? তিনি বলেছিলেন, আসল বাদশাহ তারাই, যারা দুনিয়াবিমুখ হতে পেরেছে। তাঁকে তৃতীয় প্রশ্ন করা হয়েছিলো, সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং কমীনা কারা? তিনি বলেছিলেন, যারা ইলমে দীনের মতো মহামূল্যবান সম্পদের অধিকারী হওয়ার পর তার বিনিময়ে দুনিয়া লাভের আকাঙ্ক্ষা করে তারাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট, কমীনা।

এরপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. প্রথম প্রশ্নের উত্তরটি আরো ব্যাখ্যা করে বলেন, ইলমে নববীর ধারকগণই প্রকৃত অর্থে মানুষ। কেননা অন্যান্য সকল প্রাণীর উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব সাব্যস্ত হয় ইলমে দীনের মাধ্যমে, যা কেবলমাত্র উলামায়ে কেরামই নিজেদের সীনায় হিফাযত করেন। ইলমে দীন ছাড়া অন্য কোনো যোগ্যতার বিচারে প্রাণীকুলের উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব সাব্যস্ত হয় না। শক্তিতে, শরীর ও স্বাস্থ্যে, বীরত্বে, আহার বা ভোজনে, যৌনশক্তিতে- কোনোভাবেই মানুষ অন্য প্রাণীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। শক্তিতে উট মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। হাতির শরীর ও স্বাস্থ্য মানুষের চেয়ে অনেক বড়। বীরত্ব ও সাহসিকতায় বাঘ সিংহ ইত্যাদি হিংস্র প্রাণী মানুষের চেয়ে অনেক এগিয়ে। অতিভোজনে গরুর সঙ্গে মানুষের তুলনা চলে না। চড়ুইয়ের মতো ছোট ছোট পাখির মোকাবেলায় মানুষের যৌনশক্তি কিছুই না। এইসব যোগ্যতার কোনোটিই অন্যান্য প্রাণীর উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নয়। বরং অন্যান্য প্রাণীর উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ইলমে দীনের ভিত্তিতে, যা কোনো প্রাণীর মধ্যে নেই।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া যে, শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি এই নেয়ামত তিনি আমাদেরকে দান করেছেন। এই শ্রেষ্ঠত্বের দৌলত যারা অর্জন করে তারাই উলামায়ে কেরাম। আল্লাহ তা'আলার কাছে এই অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শেষ করা যাবে না।

উলামায়ে হাক্কানী ও উলামায়ে সূ

উলামায়ে কেরাম জাতির কর্ণধার এবং রাহবার। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দৌলত দান করে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এই উম্মতের নাজাতের যিম্মাদার বানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এই ফিতনার যুগে নানারকম লোভ-লালসার পরীক্ষায় ভালো-মন্দের পার্থক্য হয়ে যায়।

উলামায়ে সূ বা দুনিয়ামুখী আলেমগণ তাদের ইলমকে দুনিয়ার স্বার্থে ব্যবহার করে। তারা ইলম অর্জন করে ধন-সম্পদ ও সুনাম-সুখ্যাতির জন্য। তাদের আকাঙ্ক্ষা থাকে, ইলমকে নানা উপায়ে ব্যবহার করে মানুষকে নিজের প্রতি আকর্ষিত করা, ভক্ত বানানো এবং তাদের ভক্তি ও সম্মানের হাদিয়া-উপঢৌকন হাসিল করা। এ ধরনের উলামাকে হাদীস শরীফে ‘লুসূসুদ-দীন’ বা দীনের চোর বলা হয়েছে। আলেমগণ উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেণী; আবার এই আলেমরাই দুনিয়ামুখী হলে সবচেয়ে নিকৃষ্ট শ্রেণীতে পরিণত হয়।

যারা ইলমে দীনকে দুনিয়ার জন্য ব্যবহার করে তাদের পরিণতির বহু নজির আমাদের সামনে রয়েছে। তাছাড়া পূর্ববর্তী উম্মতের ভয়াবহ পরিণতির নযীরও আছে। হযরত মূসা আ.-এর খাদেম আলেম ছিলো। দুনিয়া উপার্জনের উদ্দেশ্যে ইলমকে ব্যবহার করায় আল্লাহ তা'আলা তাকে শুকরে পরিণত করেছিলেন। হযরত মূসা ও হারূন আ. এর পরে কারূন সেই যুগের সবচেয়ে বড় আলেম ছিলো। ইলমের বিনিময়ে অর্জিত ধনসম্পদসহ তাকে জমিনে ধ্বসিয়ে দেয়া হয়েছে। বাল'আম বাউরের পরিণতিও সবার জানা আছে।

কাজেই বর্তমান যামানা অত্যন্ত ফিতনার যামানা। উলামায়ে কেরাম সেই ফিতনার দিকে দ্রুতগতিতে ধাবিত হচ্ছে। আপনাদের কাছে আসাতিযায়ে কেরামের তামান্না, আপনারা সব ধরনের ফিতনা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন থাকবেন এবং সর্বদা দীনের জন্য সর্বোচ্চ কুরবানী পেশ করতে থাকবেন। ইলমে দীনকে কখনোই দুনিয়ার স্বার্থে ব্যবহার করবেন না। বিভিন্ন ধরনের লোভ-লালসা এবং অনৈতিক সুযোগ-সুবিধার প্রস্তাব আসবে, কিন্তু সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে সেগুলোকে উপেক্ষা করে দীন ও দীনের দাবীকে আঁকড়ে থাকতে হবে।

উলামায়ে হক্কানী বা উলামায়ে আখিরাত কারা?

যে যেখানে দীনের যে দায়িত্বে আছেন সে দায়িত্বের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্মরণ রেখে পরিপূর্ণ সচেতনতা ও বিচক্ষণতা অবলম্বন করা জরুরী। চাই সেটা মাদরাসার খিদমত বা পরিচালনার যিম্মাদারী হোক কিংবা মসজিদে ইমামতের দায়িত্ব হোক– সর্বাবস্থায় যিম্মাদারী সম্পর্কে পূর্ণ সজাগ এবং সচেতন থাকতে হবে।

মাদরাসাগুলোর হালাত শুনলে হতভম্ব হয়ে যেতে হয়। অনেক আসাতিযায়ে কেরাম যারপরনাই দায়িত্বে অবহেলা করেন। মাদরাসাগুলোতে যারা মুদাররিস হিসেবে খিদমত করেন তারা শুধুমাত্র দরস-তাদরীসকেই দায়িত্ব মনে করেন। স্কুল-কলেজের মতো সবক পড়িয়ে দিয়েই তারা মনে করেন যিম্মাদারী আদায় হয়ে গেছে। অথচ আসাতিযায়ে কেরামের যিম্মাদারী এর চেয়ে অনেক বেশি। ছাত্রদের তরবিয়ত তথা তাদের আমল-আখলাকের উন্নতি সাধন করা আসাতিযায়ে কেরামের ফরয দায়িত্ব। তাদেরকে সুন্নাতে নববীর আদর্শে আদর্শবান করা এবং তাদের মধ্যে উম্মতের হিদায়াত ও ইসলাহের চিন্তা-

চেতনা জাগ্রত করা উস্তাদেরই যিম্মাদারী। ছাত্রদেরকে কীভাবে গড়া যায়, দিনে দিনে উন্নতি করে কীভাবে তাদেরকে সোনার মানুষে পরিণত করা যায়, যোগ্য থেকে যোগ্যতর করে গড়ে তোলা যায়– এটাই হবে আদর্শ উস্তাদের চব্বিশ ঘণ্টার ধ্যানজ্ঞান। অথচ এমন উস্তাদ খুঁজে পাওয়া এখন বড় মুশকিল।

কওমী মাদরাসার বৈশিষ্ট্য ছিলো সার্বক্ষণিক নিগরানী। আকাবিরদের নিগরানীতে ছাত্ররা দিবারাত্রি তাদের দৃষ্টির সামনে থাকতো। অথচ অধিকাংশ মাদরাসায় এসব দায়িত্ব পালনে সীমাহীন অবহেলা পরিলক্ষিত হয়। নিগরান পাওয়া যায় না। যারা আছেন তারাও নিজেদেরকে নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। ছাত্রদেরকে গড়ার জন্য কারো কোনো মাথাব্যথা নেই। মনে হচ্ছে, আমরাই যেন ইলম উঠে যাওয়ার কারণ হতে চাচ্ছি।

মসজিদের ইমামদের অবস্থাও বড় করুণ। যিম্মাদারীর ইহসাস এবং দায়িত্বের অনুভূতি তাদের নেই। প্রত্যেক মুসল্লীকে দীনের জরুরী মাসআলা মাসাইল শেখানো ইমাম সাহেবের দায়িত্ব। একজন ইমাম মুসল্লীদের মধ্যে কীভাবে কোন পদ্ধতিতে মেহনত করবেন তা এখানকার আসাতিযায়ে কেরাম শিখিয়ে দিয়েছেন। তারা আপনাদেরকে দাওয়াতুল হক, দাওয়াত ও তাবলীগ এবং নূরানী প্রশিক্ষণসহ সব ধরনের যোগ্যতার অধিকারী করে গড়ে তুলেছেন, যেন আপনারা খিদমতের ময়দানে গিয়ে কোনো বিষয়ে পিছিয়ে না পড়েন। এর সাথে সাথে ইসলাহ ও আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে সদা-সর্বদা তাকীদ এবং গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বাস্তবতা হলো, এই যোগ্যতাগুলোকে কাজে লাগানো হচ্ছে না। শুধুমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িয়ে দেয়াকে নিজের যিম্মাদারী মনে করা হচ্ছে।

অথচ প্রকৃত উলামায়ে কেরাম তারাই, নায়েবে রাসূল হিসেবে যাদের দায়িত্বের অনুভূতি আছে এবং যারা এই অনুভূতিকে কাজে লাগাচ্ছে। যার ওপর যে যিম্মাদারী এবং দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, প্রত্যেককে কিয়ামতের দিন সে দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। রাহমানিয়ার আসাতিযায়ে কেরাম আপনাদের কাছে আশা করেন, যে দায়িত্বের অনুভূতি তারা আপনাদের অন্তরে সৃষ্টি করেছেন সে অনুভূতি আপনারা সর্বদা জাগ্রত রাখবেন এবং তদানুযায়ী অবশ্যই মেহনত করবেন।

রাবেতা গঠনের উদ্দেশ্য

রাবেতার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র জামি'আর সাথে 'রবত' বা সম্পর্ক রক্ষাই নয়। বরং রাবেতা-গঠনের মূল উদ্দেশ্য হলো, আসাতিযায়ে কেরামের দিলের তামান্না অনুযায়ী কতটুকু মেহনত করা হচ্ছে তার রিপোর্ট আসাতিযায়ে কেরামের সামনে পেশ করা। যে পরিমাণ মেহনত করা হয়েছে ততটুকুরই কারগুযারী পেশ করা উচিত। বরং তাওয়ায়ু' হিসেবে তার চেয়েও কম কারগুযারী পেশ করা উচিত; যাতে ভবিষ্যতে আরো বেশি দায়িত্ব পালনের স্পৃহা সৃষ্টি হয়।

আপনাদের আগমনে জামি'আ এবং জামি'আর আসাতিযায়ে কেরাম অত্যন্ত আনন্দিত। এই আনন্দ স্থায়ী এবং সার্বক্ষণিক হোক, এটা আমাদের সবার প্রত্যাশা। কিন্তু এর জন্য শর্ত হলো, টুকরো টুকরো যে কথাগুলো বলা হলো সেগুলো পরিপূর্ণ রূপে বাস্তবায়ন করা। তাহলেই জামি'আর সঙ্গে আপনাদের 'রবত' ও বন্ধন আনন্দের হবে এবং আপনাদের ও আসাতিযায়ে কেরামের সম্পর্ক হবে সন্তুষ্টিতে ভরপুর।

আল্লাহ তা'আলা আপনাদের সকলকে উলামায়ে হক্কানী হয়ে সমস্ত দায়িত্বের অনুভূতি অনুভব করে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে জাতির খিদমতে পেশ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

অনুলিখন : মাওলানা সা'দ আরাফাত
শিক্ষক, জামি'আ ইসলামিয়া চরওয়াশপুর,
হাজারীবাগ, ঢাকা।

(৩২ পৃষ্ঠার পর : তাযকিরা...)

যা মহান আল্লাহ তা'আলার মহা কুদরতের বহিঃপ্রকাশ। এগুলো পাঠ করে পাঠকের ঈমান মজবুত থেকে মজবুততর হয়ে ওঠে এবং ঈমান আমলে এক অকল্পনীয় বিপ্লব ঘটে।

অধিকাংশ জীবনীর শেষে ঐ মনীষীর মূল্যবান নসীহত ও বাণীসমূহ সম্পৃক্ত করা হয়েছে, যা কুরআন-হাদীস ও তাদের দীর্ঘ জীবনের সারনির্যাস। প্রতিটি বাণীই এত তাৎপর্যপূর্ণ ও গভীর মর্মসমৃদ্ধ যে, এককেটি বাণীই আলোকিত জীবন গড়ার জন্য যথেষ্ট।

অনুবাদ সম্পর্কে কিছু কথা

কিতাবটি মূল ফারসীতে হলেও আল্লাহ তা'আলা এটিকে এত কবূলিয়াত দান করেছেন যে, পৃথিবীর বহু ভাষায় এটি অনূদিত হয়ে ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে। বাংলা ভাষায়ও একাধিক ব্যক্তি এর যথার্থ অনুবাদ করেছেন। মীনা বুক হাউস, ব্রাদার্স পাবলিকেশন্সসহ অন্যান্য প্রকাশনা সেগুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সাথেই ছেপে আসছে। তবে অনুবাদের সাথে সাথে কিছু টীকা সংযুক্ত করা জরুরী ছিল, যা করা হয়নি। আশা করি ভবিষ্যতে কোন মুহাক্কিক আলেম এদিকে দৃষ্টি দিবেন।

তবে বাংলাদেশের অনুবাদকগণ একটি চমৎকার কাজ করেছেন। তারা মূল কিতাবের ৭০জন মনীষীর জীবনীর সাথে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারতের আরো প্রায় ৫০জন মনীষীর জীবনী সম্পৃক্ত করেছেন। এতে কিতাবের কলেবর যদিও দ্বিগুণ হয়ে ২৫০ পৃষ্ঠা থেকে ৫০০ পৃষ্ঠায় পৌঁছেছে কিন্তু পদক্ষেপটি খুবই যুগোপযোগী ও যুগান্তকারী হয়েছে। ফলে এর গুরুত্ব ও চাহিদাও দ্বিগুণ।

কিতাব সম্পর্কে শেষ দু'টি কথা

কিতাবটিতে শাইখ আত্তার রহ. প্রতিটি মনীষীর জীবনের যুহদ ও দুনিয়া বিমুখতার অধ্যায়টি অতি গুরুত্বের সাথে তুলে ধরলেও তাদের জীবনের দাওয়াত ও দীন প্রচারের অধ্যায়টি প্রায় একেবারেই আসেনি। বরং অনেকের জীবনী পড়ে এই ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে যে, তারা কেবল নিজের ইবাদত বন্দেগী নিয়েই থাকতেন; উম্মতের জন্য কোন ফিকির করতেন না। অথচ এ ব্যাপারে কথা হল, তারা সকলেই ছিলেন দীনের মহান দা'য়ী ও নিবেদিতপ্রাণ মুখলিস মুবাল্লিগ। জীবনভর দীনের দাওয়াত নিয়ে অবিরাম ছুটে বেড়িয়েছেন দেশ হতে দেশান্তরে।

আর উপমহাদেশের যে ৫০জন মহা মনীষীর জীবনী বাংলা অনুবাদকগণ সংযুক্ত করেছেন তাতে অবশ্য তাদের জীবনের যুহদ ও দাওয়াত উভয় দিকই অতি গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

আমাদের জানামতে এই কিতাবে হাতে গোনা অল্প কিছু রেওয়ায়েত এসেছে; তবে তার সবই সহীহ। কেবল প্রখ্যাত তাবেয়ী ওয়াইস আলকরনী রহ. এর জীবনীতে কয়েকটি মুনকার রেওয়ায়েত এসেছে। এছাড়া কোন কোন জীবনীতে কিছু ঘটনা এসেছে, যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে মাকাসিদে শরী'আ ও মিজাযে শরী'আর খিলাফ মনে হলেও বাস্তবে তা নয়; যা একটু গভীর দৃষ্টি দিলেই বুঝে আসে। হ্যাঁ, সামান্য কয়েকটি ঘটনা আছে, যা বাস্তবেই মুনকার বলে মনে হয়। তাই ঢালাওভাবে এর সকল ঘটনার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করার কোন অবকাশ নেই। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ সকল ওলীদের জীবনী থেকে পাথেয় সংগ্রহ করে আলোকময় জীবন গঠনের তাওফীক দান করুন। আমীন।

লেখক : মুদাররিস, আশরাফুল মাদারিস সতীঘাটা, যশোর

কুরবানী সংক্রান্ত জরুরী মাসাইল

মাওলানা মাহমূদুল হাসান

১. কুরবানীর পশু

মাসআলা : উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, ও দুম্বা এ ছয় শ্রেণীর গৃহপালিত পশু দ্বারা কুরবানী করা বৈধ। এগুলো ছাড়া কোন বন্য জানোয়ার যেমন হরিণ, বনগরু কিংবা অন্য কোন গৃহপালিত পশু যেমন মুরগী, মোরগ ইত্যাদি দ্বারা কুরবানী করা বৈধ নয়। বরং কুরবানীর দিনগুলোতে কুরবানী দাতাদের সাদৃশ্য অবলম্বনের নিয়তে মুরগী, মোরগ জবাই করাও মাকরুহ।

(সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৫৫৮, ২৯৪, সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৯৬৬, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১৫০৫, আল মুগনী ইবনে কুদামা রহ. কৃত ১৩/৩৬৮, ফাতাওয়া কাযীখান ৩/৩৪৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৪৬, ইমদাদুল মুফতীন; পৃষ্ঠা ৯৫১, ফাতাওয়া রহীমিয়া ১০/৫৬, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৬/২৬৮)

মাসআলা : ক্রটিযুক্ত যে সকল পশুর দ্বারা কুরবানী করা বৈধ নয়-

- ✓ এমন প্রাণী যার দু'চোখ অন্ধ কিংবা এক চোখের জ্যোতি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে।
- ✓ এমন দুর্বল প্রাণী যার হাড্ডির মগজ শুকিয়ে গেছে।
- ✓ এমন খোড়া প্রাণী যে তার জবাইয়ের স্থান পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারে না।
- ✓ এমন রুগ্ন প্রাণী যার সুস্থতার আশা নেই।
- ✓ এমন প্রাণী যার এ পরিমাণ দাঁত নেই, যা দ্বারা সে খাবার চিবিয়ে খেতে পারে।
- ✓ এমন প্রাণী যার কানের অধিকাংশ কাটা কিংবা জন্মগত ভাবে কান-ই নেই।
- ✓ এমন প্রাণী যার লেজ নেই কিংবা লেজের অধিকাংশ কাটা। (তবে দুম্বার ক্ষেত্রে লেজ না থাকলেও তার দ্বারা কুরবানী সহীহ হবে)।
- ✓ এমন প্রাণী, যার শিং গোড়া থেকে এমনভাবে ভেঙ্গে বা উপড়ে গেছে যে, তার কারণে মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। (তবে যে প্রাণীর শিং জন্মগতভাবে উঠেনি, বা উঠার পর কিছু অংশ ভেঙ্গে বা উপড়ে গেছে, কিন্তু মস্তিষ্ক নিরাপদ রয়েছে তার দ্বারা কুরবানী করা বৈধ আছে।)

(সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ২৮০২, সুনানে নাসায়ী; হা.নং ৪৩৬৯, ৪৩৭২, শরহু মাআনিল আসার; হা.নং ৬১৯৫, ৬১৯৭, আলবিনায়া শরহুল হিদায়া ১১/৩৮, ইমদাদুল আহকাম ৪/২০৮, আহসানুল ফাতাওয়া ৭/৫১৪-৫১৭)

মাসআলা : খাশী (অণ্ডকোষ কর্তিত প্রাণী), বলদ দ্বারা কুরবানী করতে কোন সমস্যা নেই। স্বয়ং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাশী দ্বারা কুরবানী করেছেন।

হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন-

'নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কুরবানী করার ইচ্ছা করলেন তখন কালচে সাদা রংয়ের শিংবিশিষ্ট, হৃষ্টপুষ্ট, বড় দুটি খাশী করা দুম্বা ক্রয় করলেন। এরপর একটিকে তাওহীদে বিশ্বাসী নিজ উম্মতের পক্ষ হতে এবং অপরটি নিজের এবং নিজ পরিবারের পক্ষ হতে কুরবানী করলেন।'

(সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ৩১২২, মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২৫৮৮৬, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ২৭৯৫)

মাসআলা : পশুর বয়স-

কুরবানী সহীহ হওয়ার জন্য উটের ক্ষেত্রে চান্দ্র বর্ষ হিসেবে সর্বনিম্ন ৫ বছর, গরু-মহিষের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ২ বছর, এবং ছাগল, ভেড়া ও দুম্বার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন এক বছরের হওয়া আবশ্যক। এর কম হলে উক্ত পশু দ্বারা কুরবানী বৈধ হবে না। তবে কেবল ভেড়া ও দুম্বার ক্ষেত্রে- যখন তা হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার দরুণ এক বছরের বলে মনে হয়- তখন (সর্বনিম্ন) ছয়মাস বয়সের হওয়ার শর্তে তা দ্বারা কুরবানী করা জায়েয হবে। পক্ষান্তরে ছাগল দেখতে যতই হৃষ্টপুষ্ট হোক না কেন, এক বছরের কম হলে তার দ্বারা কুরবানী করা বৈধ নয়।

উল্লেখ্য, নির্ধারিত বয়স পূর্ণ হওয়ার পর দাঁত পরিবর্তন হোক বা না হোক তা দ্বারা কুরবানী করা জায়েয। তবে দুধের দাঁত পরিবর্তন হলে তা নিশ্চিতভাবে কুরবানীর যোগ্য। দাঁত পরিবর্তন না হওয়ার ক্ষেত্রে বয়স নির্ণয়ে খোদ লালনকারী ব্যতীত ব্যবসায়ীর কথা গ্রহণযোগ্য নয়।

(সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৯৬৩, ১৯৬১, আল মুগনী ১৩/৩৬৮, ফাতাওয়া শামী ৬/৩২১, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৫৮, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩/৫৬৮, ফাতাওয়া রহীমিয়াহ ১০/৫০, আহসানুল ফাতাওয়া ৭/৫২০)

২. অন্যের পক্ষ হতে কুরবানী করার বিধান

ওয়াজিব কুরবানী

অন্যের পক্ষ হতে ওয়াজিব কুরবানী সহীহ হওয়ার জন্য যার পক্ষ হতে কুরবানী করা হচ্ছে তার অনুমতি নেয়া আবশ্যক। অনুমতি ছাড়া করা হলে এ কুরবানী উক্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে নয়; বরং কুরবানীদাতার পক্ষ থেকে আদায় হবে।

হ্যাঁ, কুরবানীদাতা যদি নিজের এমন কোন আত্মীয়-স্বজন কিংবা পরিচিতদের পক্ষ হতে অনুমতি ছাড়া কুরবানী করেন, যারা তার দ্বারাই প্রতি বছর কুরবানী করিয়ে থাকেন তবে এমন আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিতদের পক্ষ হতে তাদের সুস্পষ্ট অনুমতি ছাড়াই পূর্বের অভ্যাসের ভিত্তিতে কুরবানী করা বৈধ হবে। এবং 'পূর্ব অভ্যাস' কে 'পরোক্ষ অনুমতি' ধরে নেয়া হবে। কাজেই স্ত্রীর পক্ষ হতে যদি স্বামী কর্তৃক প্রতি বছর কুরবানী করার অভ্যাস থাকে তাহলে স্ত্রীর সুস্পষ্ট অনুমতি ছাড়াই তার পক্ষ হতে কুরবানী করা স্বামীর জন্য বৈধ হবে। তা সত্ত্বেও অনুমতি নিয়ে নেয়া ভালো।

নফল কুরবানী

উপর্যুক্ত হুকুম কেবল অন্যের পক্ষ হতে ওয়াজিব কুরবানী আদায়ের নিয়ত করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে যদি কেউ কারো পক্ষ হতে নফল কুরবানী আদায় করার নিয়ত করে তবে এ ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির পূর্ব অনুমতি কিংবা অবগতি আবশ্যক নয়।

উল্লেখ্য, নফল কুরবানীর ক্ষেত্রে এবং প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ অনুমতি ছাড়া ওয়াজিব কুরবানী করার ক্ষেত্রে জবাইকৃত গোশতের মালিক কুরবানী দাতা হবে । এবং সে তার নিজস্ব কুরবানীর মতই তার গোশত নিজে এবং ধনী-গরীব সবাইকে খাওয়াতে পারবে। তবে অনুমতির ভিত্তিতে ওয়াজিব কুরবানী আদায় সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে কুরবানী যার পক্ষ থেকে করা হয়েছে গোশতের মালিক সে হবে।

(ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৪৮, ফাতাওয়া শামী ৬/৩১৫, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩/৬১০, ইমদাদুল আহকাম ৪/২৭৬)

৩. মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে নফল কুরবানী

মাসআলা : যেমনিভাবে মৃত ব্যক্তিদের পক্ষ হতে নফল হজ্জ-উমরা করা বৈধ আছে, তেমনিভাবে নফল কুরবানী করাও বৈধ আছে। তবে জনসাধারণের জন্য সহজ পন্থা হল কুরবানী দাতা নিজের পক্ষ হতে কুরবানীর এবং মৃত ব্যক্তির জন্য ঈসালে সওয়াবের নিয়ত করবে।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. এর সূত্রে এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিং বিশিষ্ট একটি দুম্বা জবাই করলেন, এরপর দু'আ করলেন,

هذا عنى و عمن لم يضح من امتى.

অর্থ : (হে আল্লাহ!) এ কুরবানী আমার পক্ষ হতে এবং ঐ সকল উম্মতের পক্ষ হতে যারা কুরবানী করেনি। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ১১০৫১, وهو حديث صحيح الاسناد, শরহু মা'আনিল আসার; হা.নং ৬২৩০, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১৫০৫, সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ৩১২২)

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, 'যারা কুরবানী করেনি' বাক্যের মধ্যে ঈমানদার মৃত ব্যক্তিরাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আম্মাজান আয়েশা রাযি., হযরত আবূ রাফে রাযি., হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. ও হযরত জাবের রাযি. থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। (ই'লাউস সুনান ১৭/২৬৮)

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত আলী রাযি. একবার দুটি দুম্বা জবাই করলেন, একটি নিজের পক্ষ হতে আরেকটি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হতে। এরপর বললেন,

امرنى رسول الله صلي الله عليه وسلم ان اضحي عنه فانا اضحي عنه ابدا.

অর্থ : নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তার পক্ষ হতে কুরবানী করতে বলেছেন। সুতরাং আমি সবসময় তার পক্ষ হতে কুরবানী করব। (মুস্তাদরাকে হাকেম; হা.নং ৭৫৫৬ قال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد(تعليق–من تلخيص الذهبى)–صحيح আরো দ্রষ্টব্য মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ৮৪৩, সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী; হা.নং ১৯১৮৮, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১৪৯৫)

এ সকল বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মৃতের পক্ষ হতে কুরবানী করা বৈধ আছে। এবং এ কুরবানী দ্বারা মৃত ব্যক্তি সওয়াব পেয়ে থাকে। অন্যথায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনই মৃত উম্মতের পক্ষ হতে কুরবানী করতেন না এবং হযরত আলী রাযি. কেও তার পক্ষ হতে কুরবানী করতে বলতেন না। উল্লেখ্য, মৃতের পক্ষ হতে নফলের নিয়ত করুক কিংবা শুধু মৃতের নামে ঈসালে সওয়াবের নিয়ত করুক উভয় অবস্থায় একাধিক মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানী করার নিয়ত করা যেতে পারে এবং এ ক্ষেত্রদ্বয়ে গোশতের মালিকও কেবল কুরবানী দাতাই হবে এবং সে তার নিজস্ব কুরবানীর মতই তার গোশত ধনী গরীব সবাইকে খাওয়াতে পারবে।

(ফাতাওয়া শামী ৬/৩২৬, ৩৩৫, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩/৫৭৩, ইমদাদুল আহকাম ৪/২৩৩)

৪. কুরবানীর সঙ্গে আকীকা

মাসআলা : যে সকল পশু দ্বারা কুরবানী করা বৈধ, সে সকল পশু দ্বারা আকীকা করাও বৈধ আছে। কুরবানীর বড় পশু যেমন উট, গরু, মহিষে কয়েক অংশ আকীকা আর কয়েক অংশ কুরবানী- এভাবে কুরবানীর সাথে আকীকা একত্রিত করাও বৈধ আছে। তেমনিভাবে একটি বড় পশুতে সম্পূর্ণ সাত অংশ এক বা একাধিক আকীকার জন্য দেয়া জায়েয আছে, চাই একই ব্যক্তির কয়েকজন সন্তানের আকীকা হোক, কিংবা একাধিক ব্যক্তির সন্তানদের আকীকা হোক।

(ফাতাওয়া শামী ৬/৩২৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৫১, আলমুগনী ১৩/৩৯২, ইমদাদুল মুফতীন; পৃষ্ঠা ৯৬৮, ইমদাদুল আহকাম; পৃষ্ঠা ২২৮)

৫. কুরবানীর পশুর পেটের বাচ্চা

গর্ভবতী পশু দ্বারা কুরবানী করা বৈধ আছে। তবে প্রসবের একেবারে নিকটবর্তী সময়ে গর্ভবতী পশু জবাই করা মাকরূহ!

(ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৩১, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৬/২৬৮)

গর্ভবতী কুরবানীর পশু জবাই করার পূর্বে কিংবা পরে যদি বাচ্চা জীবিত বের হয়ে আসে, তবে মা গাভীর সাথে সাথে উক্ত বাচ্চাকেও 'আইয়ামে নহরের (যিলহজ্জের ১০, ১১ ও ১২তম দিবস) মধ্যে কুরবানী করে দিতে হবে এবং তার গোশত খাওয়াও বৈধ আছে।

যদি বাচ্চা জবাই করা না হয়, ইতোমধ্যে আইয়ামে নহর শেষ হয়ে যায়, তবে জীবিত অবস্থায়ই উক্ত বাচ্চাকে গরীবদের মাঝে সদকা করে দিতে হবে। কেননা, এ বাচ্চার গোশত যেমন নিজে খাওয়া কিংবা ধনীদের খাওয়ানো জায়িজ নেই, তেমনি তা বিক্রি করা কিংবা তা লালন-পালন করে পরবর্তী বছর কুরবানী করাও বৈধ নয়।

(ফাতাওয়া শামী ৬/৩২২, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৪৮, আলমুহাল্লা বিলআসার লিইবনে হাযম ৬/৩৯ কিতাবুল উযহিয়াহ, ই'লাউস সুনান ১৭/২৭৬, ফাতাওয়া রহীমিয়াহ ১০/২৭, ৪৩)

৬. কুরবানীর গোশত বাসার কাজের লোকদেরকে খাওয়ানো

মাসআলা : বর্তমান বাসা-বাড়িতে নির্ধারিত বেতনের শর্তে যে কাজের লোক রাখা হয়, যদি তার খানা প্রদানের বিষয়টিও পারিশ্রমিকের একটি অংশ হিসাবে মালিকের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং খানা দেয়া না দেয়ার কারণে বেতনের পরিমাণে তারতম্য ঘটে, তবে এমন কাজের লোককেও রান্না করা কুরবানীর গোশত খাওয়ানো বৈধ আছে। কেননা, রান্না করার পরে তাতে কুরবানীর হুকুম শেষ হয়ে গেছে।

(সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৩১৭, ফাতাওয়া শামী ৬/৩২৮, আলমুগনী ১৩/৩৮২, ইমদাদুল মুফতীন; পৃষ্ঠা ৯৬৫)

৭. কুরবানীর গোশত পঞ্চায়েতের মাধ্যমে দান করা

মাসআলা : কোন কোন এলাকায় প্রচলন রয়েছে যে, সমাজের কুরবানী দাতাগণ কুরবানী করার পর পূর্ণ অংশকে তিনভাগ করে একভাগ সমাজের নামে দিয়ে দেয়। এরপর সমাজের পঞ্চায়েত বা নেতৃবৃন্দ এই ভাগগুলোকে জমা করে সমাজের ঘর হিসেবে ভাগ করে তা বণ্টন করে দেয়। বণ্টনের ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় ধনীদেরকে এমনকি যারা কুরবানী করেছে তাদেরকে 'সমাজের গোশতের' ভাগ দেয়া হয়...!

শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে কুরবানীর গোশত বণ্টনের প্রচলিত সামাজিক এই 'সমন্বিত পদ্ধতি' একাধিক কারণে নাজায়েয-

১. কুরবানীর গোশত বণ্টনের ক্ষেত্রে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত পন্থা বর্জন করা হয় এবং এ ব্যাপারে অন্যায়ভাবে কুরবানীদাতার উপর সামাজিক চাপ প্রয়োগ করা হয়।

   কেননা, কুরবানীর গোশতের এক তৃতীয়াংশ গরীবদেরকে দান করা মুস্তাহাব হলেও তা সম্পূর্ণ কুরবানী দাতার ব্যক্তিগত বিষয় । কতটুকু সদকা করবে? কাকে করবে, আত্মীয়-স্বজনকে নাকি এলাকাবাসীকে? কিংবা আদৌ করবে কিনা? এ ব্যাপারে বিবেচনার অধিকার কেবল কুরবানীদাতার নিজের। বস্তুত কুরবানীর গোশতে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার

অন্যদের নেই। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনই সাহাবাদেরকে এমন আদেশ করেননি যে, তোমরা নিজেদের কুরবানীর একটা অংশ আমার কাছে নিয়ে এসো, আমি তা সমাজের মাঝে বণ্টন করে দিব...! সাহাবায়ে কেরামও কখনো এভাবে সামাজিকভাবে সমন্বিত বণ্টন করেননি।

২. এ ব্যবস্থাপনায় সকলে খুশি মনে অংশগ্রহণ করে এটা নিশ্চিত নয়। কেউ সামাজিক নিয়মে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অংশগ্রহণ করে এমন আশঙ্কাও থাকে। সেক্ষেত্রে ঐ লোকের প্রদত্ত গোশতের অংশ কারো জন্যই হালাল হবে না।

৩. এমনও কেউ থাকতে পারে, যে তার দানকৃত অংশ গরীবদেরকে দিতে চায়, ধনীদেরকে নয়। ফলে দাতার সন্তুষ্টি নিশ্চিত না হওয়ায় ধনীদের জন্য ঐ ব্যক্তির প্রদত্ত অংশ হালাল হবে না।

৪. কারো মান্নতের অংশও থাকতে পারে, যা শুধু গরীবদের হক, ধনীদের জন্য মান্নতের অংশগ্রহণ করা বৈধ নয়। অথচ উক্ত পদ্ধতিতে ধনী-গরীব সবাইকেই অংশ দেয়া হয়।

৫. যারা সমাজে গোশত দিচ্ছে, তাদের সবাই হালাল সম্পদ দিয়ে কুরবানী করেছে কিনা? তা নিশ্চিত নয়। কাজেই এ আশঙ্কা রয়েছে যে, সমাজের এই গোশতের মাঝে হারাম গোশতও রয়েছে, যা খাওয়া কারো জন্যই জায়েয নয়।

সুতরাং সমাজের নীতিনির্ধারকদের দায়িত্ব হল কুরবানীর গোশত বণ্টনের এই নাজায়েয পন্থা বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এবং গোশত বণ্টনের বিষয়টিকে কুরবানী দাতার খুশি এবং ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া। পাশাপাশি অন্যান্যদের উচিত এ পদ্ধতি বন্ধ করার ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া এবং গোশতদাতার সন্তুষ্টি সুনিশ্চিত না হওয়ায় এই সমন্বিত বণ্টন থেকে গোশত গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা ।

তবে হ্যাঁ, কোন এলাকায় যদি প্রচলিত এ পদ্ধতির পরিবর্তে অন্যদের হস্তক্ষেপ ছাড়া স্বপ্রণোদিত হয়ে সমাজের কয়েকজন মিলে তাদের যার যতটুকু ইচ্ছা এক জায়গায় একত্র করে শুধু গরীবদের মাঝে বণ্টনের ব্যবস্থা করে তবে তাতে কোন অসুবিধা নাই, চাই তা শরীকদের পরস্পরে বণ্টনের পরে হোক কিংবা সকলের সম্মতিক্রমে বণ্টনের পূর্বে হোক।

(সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৫৬৯, সুনানুল কুবরা লিলবাইহাকী; হা.নং ১১৫২৬, বাদায়িউস সানায়ে' ৪/২২৪, ফাতাওয়া শামী ৬/৩২৮, আলবাহরুর রায়িক ৮/৩২১-৩২৭, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৬/৩৯১-৩৯২, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩/৫৪৯)

৮. কুরবানীর চামড়া মসজিদের ইমাম সাহেব কিংবা মক্তবের শিক্ষককে হাদিয়া করা

মাসআলা : কোন কোন এলাকায় এ প্রচলন রয়েছে যে, ইমাম সাহেব কিংবা মক্তবের শিক্ষকের বেতন নির্ধারিত না থাকায় কিংবা তা অপ্রতুল হওয়ায় অথবা অন্য কোন কারণে 'হাদিয়ার নামে' এলাকাবাসী ইমাম সাহেব বা মক্তবের শিক্ষককে কুরবানীর চামড়া প্রদান করে থাকে। যদিও মুখে বলা হয় 'হাদিয়া' কিন্তু বাস্তবে অপ্রতুল বেতনে ইমাম সাহেব বা মক্তবের শিক্ষকের জন্য উক্ত দায়িত্ব পালনের বিষয়টি নির্ভর করে এ চামড়া প্রাপ্তির উপর! কাজেই গ্রহীতা ধনী হোক বা গরীব হোক, হাদিয়ার নামে কুরবানীর গোশত, চামড়া কিংবা চামড়া বিক্রিত টাকা প্রদান করার এ প্রচলন শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নাজায়েয! কেননা, কুরবানীকৃত পশুর কোন অংশ কুরবানীদাতার জন্য বিক্রি করা বা পারিশ্রমিক হিসাবে কাউকে প্রদান করা বৈধ নয়। প্রদান করা হলে দাতার জন্য সমপরিমাণ মূল্য গরীবদেরকে সদকা করা আবশ্যক।

হ্যাঁ, কোথাও যদি এমন হয় যে ইমাম/শিক্ষকের বেতন পর্যাপ্ত, ইমাম/শিক্ষককে চামড়া প্রদানের প্রচলনও সেখানে নেই, এবং বাস্তবেও লোকেরা হাদিয়ার নিয়তেই ইমাম সাহেব/শিক্ষককে সরাসরি চামড়া কিংবা গোশত প্রদান করে থাকে, তবে তা বৈধ হবে এবং গ্রহীতার জন্যও তা নেয়া জায়েয হবে, চাই তিনি ধনী হোন কিংবা দরিদ্র। তবে যদি কেউ চামড়া বিক্রিত মূল্য হাদিয়া দেয় তাহলে দরিদ্র তথা যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত হওয়ার শর্তে তা নেয়া বৈধ হবে, অন্যথায় নয়।

(সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৩১৭, ফাতাওয়া শামী ৬/৩২৮, আলমুগনী ১৩/৩৮২, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৬/৩৮০, ফাতাওয়া রহীমিয়াহ ১০/৫৮৩-৫৮৪)

৯. মাদরাসা কর্তৃপক্ষ দাম চূড়ান্ত না করে ট্যানারিকে চামড়া দিয়ে দেয়া

মাসআলা : দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গরীব ছাত্রদের জন্য সংগৃহিত কুরবানীর পশুর চামড়া বিক্রির প্রচলিত একটি পদ্ধতি হল, ঈদুল আযহার দিন শেষে 'চামড়া শিল্প প্রতিষ্ঠান' মাদরাসার সংগৃহীত চামড়া কোন দর-দাম না বলেই নিয়ে যায় এবং কিছুদিন পর তারা মাদরাসা কর্তৃপক্ষকে একটা দাম জানিয়ে দেয়। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঘোষিত মূল্য বাজার দর অনুযায়ী বা তার চেয়েও ভাল হবে বলে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ আশাবাদী থাকে এবং পরবর্তীতে ঘোষিত মূল্যের উপর মাদরাসা কর্তৃপক্ষ কোন দ্বিমত করে না। অথবা দ্বিমত করলেও তার সন্তোষজনক মীমাংসা হয়ে যায় এবং মূল্যের লেনদেন নিয়েও উল্লেখযোগ্য বিরোধ দেখা যায় না..।

শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে চামড়া বিক্রির প্রচলিত এ পদ্ধতি বৈধ আছে। এবং এতে 'চামড়া শিল্প প্রতিষ্ঠান' কর্তৃক মূল্য ঘোষণা এবং মাদরাসা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তা মেনে নেয়ার সময়ই ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। ফিকহী পরিভাষায় এমন লেনদেন بيع الاستجرار এর অন্তর্ভুক্ত। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: ফাতাওয়া শামী ৪/৫১৬

বর্তমানে যেহেতু এধরণের বেচা-কেনার প্রচলণ হয়ে গেছে এবং ক্ষেত্র বিশেষে তা প্রয়োজনীয়ও হয়ে দাঁড়ায়, তাই এ লেনদেনকে بيع الاستجرار এর ন্যায় জায়েয গণ্য করা হবে। বরং بيع الاستجرار এর তুলনায় এতে শরয়ী আপত্তি অনেক কম। কেননা এক্ষেত্রে বিক্রয়ের চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার সময় বিক্রিত পণ্য বাস্তবে বিদ্যমান থাকে। বিক্রয় চূড়ান্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তা বিক্রেতার মালিকানায় ধর্তব্য হলেও তাতে শরয়ী কোন সমস্যা নেই। যেহেতু সে সময় ক্রেতা পক্ষের সমস্ত কর্মকাণ্ড বিক্রেতার সম্মতিক্রমেই হয়ে থাকে এবং এ নিয়ে বিবাদের দৃষ্টান্ত বিরল!

অবশ্য বর্ণিত ক্রয়-বিক্রয় যদিও চূড়ান্ত পর্যায়ে বৈধতা পায়, তদুপরী লেনদেনের প্রাথমিক পর্যায়ে অস্পষ্ট মূল্যের ভিত্তিতে ক্রেতাকে পণ্য প্রদানের ক্ষেত্রে শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে আপত্তি থেকেই যায়। তাই দীনী প্রতিষ্ঠানসহ সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য সাধারণ অবস্থায় এমন লেনদেন করা অনুচিত। বরং শুরু থেকেই মূল্য নির্ধারণ করে নেয়াই উত্তম।

(ফাতাওয়া শামী ৪/৫১৬, বুহুস ফী কাযায়া ফিকহিয়্যা মু'আসারাহ ১/৬২-৬৫)

(১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

(২ পৃষ্ঠার পর : সম্পাদকীয়)

কুরআন-সুন্নাহয় যেখানেই প্রতিশোধমূলক ও আক্রমণাত্মক সশস্ত্র জিহাদের নির্দেশ এসেছে আমার জানামতে সব ক্ষেত্রেই ইসলামী রাষ্ট্র পূর্ব শর্ত। সারাধণ অবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া কিংবা রাষ্ট্রের বাধা উপেক্ষা করে সাধারণ জনগণকে সশস্ত্র জিহাদ করার বিধান শরীয়ত প্রদান করেনি। কারণ যেখানে জিহাদের প্রতিঘাত সামাল দেওয়ার শক্তি থাকবে না সেখানে জিহাদ বিদ্যমান শান্তিটুকুও নষ্ট করে ছাড়বে। আজ সিরিয়ার সাধারণ জনগণের বাস্তুভিটা ছেড়ে ভিনদেশে ও শক্রুর আঁচলে আশ্রয়ের খোঁজে দেশান্তরিত হওয়া আর মাঝেমধ্যে সাগরে সলিল সমাধিই এর জ্বলন্ত প্রমাণ।

মোটকথা, শান্তির ধর্ম ইসলামে শান্তির জন্য জিহাদের মূল দায়িত্ব মুসলিম রাষ্ট্রনায়কদের। তাদের অবহেলায় অনীহায় কিংবা বিরোধিতায় এ দায়িত্ব পালিত না হওয়ার দায় সম্পূর্ণরূপে তাদের কাঁধেই বর্তায়। জনগণের দায়িত্ব হল, ঈমান-আমলের ব্যাপকতার মাধ্যমে দায়িত্ব সচেতন রাষ্ট্রনায়কদের ক্ষেত্র তৈরী করা; রাষ্ট্রের কাজ নিজ হাতে তুলে নেয়া নয়। উদাহরতঃ ইসলামী দণ্ডবিধি যেমনঃ চোরের হাত কাটা, ব্যভিচারীকে হত্যা করা বা বেত্রাঘাত করা ইত্যাদি বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রশাসনের; জনগণের নয়। প্রশাসন না করলেও জনগণ এসব দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করতে পারবে না। অন্যথায় সমাজে যে ফিতনা সৃষ্টি হবে জনগণ তা সামাল দিতে পারবে না।

(ঙ) সন্ত্রাস মানে সাধারণ জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তা বিনষ্ট করা বা বিঘ্নিত করা। মুসলিম কিংবা অমুসলিম যে-ই শান্তি ও নিরাপত্তায় থাকতে চায় তার শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার অনুমতি ইসলামে নেই; থাকতে পারেও না। মুসলমান নামের কেউ সন্ত্রাসী হলে বুঝতে হবে, সে হয় মুনাফিক, না হয় চরম পর্যায়ের গোমরাহ লোক কিংবা কোন কারণে ভারসাম্যহীন।

আমাদের জানামতে অদ্যাবধি উল্লেখযোগ্য যত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটেছে তার সব ক'টিতেই কাফের-মুশরিকদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হাত রয়েছে। কারণ আল্লাহ তাআলার ঘোষণা মতে কাফের মুশরিকরা হল চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও অধম। এদের অধিকাংশই মানবতার শক্রু; হিংস্র জন্তুর চেয়েও হিংস্র। এদের হিংস্রতা সম্পর্কে যার ধারণা নেই সে অন্ধ ও নির্বোধ। বর্তমান দুনিয়ার সকল অশান্তির ইন্ধনদাতা তারা। মুসলিম নামে যারা অশান্তি ছড়ায় তাদের অধিকাংশই কাফের মুশরিকদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শিষ্য। হ্যাঁ, দু-চারজন যদি এর ব্যতিক্রম হয় তাহলে তাদের উদাহরণ ঐ গৃহবধূর মতো যে লম্পট স্বামীর নির্যাতন, উপেক্ষা ও বঞ্চনায় অতিষ্ঠ হয়ে ঘুমন্ত গর্ভজাত সন্তানদের গলা টিপে হত্যা করে, অতঃপর নিজেও গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে । এ গৃহবধূ নিশ্চয় অনেক বড় অপরাধী; তার দুনিয়া আখেরাত উভয়কাল ব্যর্থ। তার প্রতি যথাসম্ভব তিরস্কার র্ভৎসনা করুন, তাকে থুথু দিন কিন্তু এ ক্ষেত্রে লম্পট স্বামীটির প্রতি নীরবতা পালন করা কি ঠিক হবে?

আজ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের প্রতি যে জুলুম চলছে, মুসলমানদের প্রাণের চেয়েও আপন, মানবতার মুক্তির দিশারী নবীয়ে রহমতকে নিয়ে যে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা হচ্ছে এর বিপরীতে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানেরা এবং বিশ্ববিবেক যেমন নীরবতা পালন করছে তাতে কোনো অপরিণামদর্শী অতিআবেগী অপরিপক্ক কোন মুসলমান যদি সেই নির্যাতিতা গৃহবধূর পথ অবলম্বন করে তাহলে এর দায় কি শুধু তার কাঁধেই বর্তাবে? তিরস্কৃত কি শুধু সে একাই হবে? এ ক্ষেত্রে জুলুমবায হঠকারী উগ্র ইসলামবিদ্বেষীদেরকে কি মোটেও তিরস্কার করা হবে না? তাদের সীমালঙ্ঘন প্রতিরোধের কি কোন চেষ্টাই করতে হবে না? এমনটি চলতে থাকলে ঐ অপরিণামদর্শী ভারসাম্যহীন আত্মহননকারীদের রুখবে কে? মজার বিষয় হল, আল্লাহর জমিনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব আল্লাহর প্রতিনিধি মুসলমানদের। শরয়ী নিয়মে জিহাদ করা সে দায়িত্বের চূড়ান্ত পর্ব। পক্ষান্তরে আল্লাহদ্রোহী শয়তানী শক্তির কাজ হল, ফাসাদ করা ও অশান্তি ছড়ানো। এর চূড়ান্ত রূপ হল বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ বাধানো। পরিতাপের বিষয় হল, শয়তানের দোসর কাফের গোষ্ঠীরা তো বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অহেতুক যুদ্ধ বাধিয়ে রেখেছে পুরোদমে। আর গোটা মানব জাতিকে অশান্ত করে রেখেছে। অপরদিকে মুসলিম রাষ্ট্রনায়কেরা শান্তি প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত কাজ পবিত্র জিহাদ থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে। এরপরও মুসলমানরা নাকি সন্ত্রাসী!

(চ) সাধারণ মুসলমানদের জন্য এ পর্যায়েও হাল ছেড়ে দেওয়ার উপায় নেই। নিজেদের আশপাশে তাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। যেন মুসলমান নামের কাউকে আল্লাহদ্রোহীরা ব্যবহার করতে না পারে কিংবা কোন আবেগী মুসলমান নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে না ফেলে। বিশেষ করে উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের গতিবিধি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। দৃষ্টির আড়াল হওয়া কিংবা অসৎ সঙ্গীর পাল্লায় পড়ার সুযোগ দেওয়া যাবে না। সৎ সঙ্গ ও সঠিক উৎস থেকে সঠিক ইসলামী জ্ঞান অর্জনের প্রতি উৎসাহ দিতে হবে। আকাশ-কালচার, ফেসবুক, ইন্টারনেট ব্যবহার হতে যথাসাধ্য দূরে রাখতে হবে। অন্যথায় তারা হয় নাস্তিক হবে, অথবা চরমপন্থী হবে। কারণ সেখানে অদৃশ্য শিক্ষকদের মাধ্যমে মূলত এ দু'ধারার শিক্ষাই দেওয়া হয়। কোন অভিভাবকের বিশ্বাস না হলে মনে মণিকোঠায় লিখে রাখুন, বায়বীয় উৎসে আসক্ত আপনার সন্তান নাস্তিক কিংবা চরমপন্থী ছাড়া তৃতীয় কিছু হওয়ার সম্ভাবনা আপাতত নেই।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম মিল্লাতকে সব ধরণের বিভ্রান্তি থেকে হেফাজতে রাখুন। আ-মীন।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর আলোকে প্রণীত

জাতীয় পাঠ্যপুস্তক : এন্টার হিন্দুজম, মাইনাস ইসলাম

মাওলানা মুহাম্মাদ আবূ সাইম

এক.

বিষয়টি নিয়ে গত কয়েক বছর ধরেই অল্প-বিস্তর গুঞ্জণ চলছিল। এ বছর পাঠ্যপুস্তক বিতরণের পর তা আলোচনা-সমালোচনার রূপ নিয়েছে। অভিযোগ, জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তক হিন্দুবাদের প্রতিনিধিত্ব করছে। নতুন পাঠ্যপুস্তক থেকে পরিকল্পিতভাবে ইসলাম ও ইসলামী ভাবাদর্শকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে। বোঝার উপায় নেই, পাঠ্যপুস্তকগুলো বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণীত হয়েছে, নাকি পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার্থীদের জন্য। দেশ ও জাতির প্রতি দায়িত্ব সচেতন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি সংবেদনশীল উলামায়ে কেরাম ও অভিভাকবৃন্দ নিজ নিজ অবস্থান থেকে এর প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। এখনও তা অব্যাহত আছে। আমরা মনে করি, যেভাবে এবং যে উদ্দেশ্যেই হোক ভুল হয়ে গেলে শীঘ্রই তা শোধরানো দরকার। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, ভুল শোধরানোর দায়িত্ব যাদের তারা অভিভাবকবৃন্দ ও উলামায়ে কেরামের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও অভিযোগ-পরামর্শ আমলে না নেয়ার পণ করে আছেন। সম্ভবত এঁদের শালীন ও মার্জিত প্রতিবাদকে তারা যথার্থ ও যথেষ্ট মনে করছেন না। অগত্যা জনসাধারণকে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা এবং ভদ্রতা ও শালীনতার গণ্ডিতে থেকে প্রতিবাদে সোচ্চার করে তোলা আমরা নিজেদের কর্তব্য স্থির করেছি। আমরা এখনও আশাবাদী, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও ব্যক্তিবর্গ ২০১৭ সালের প্রথম দিনটিতে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের হাতে সংশোধিত ও পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তক তুলে দেয়ার জন্য শীঘ্রই যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন এবং বর্তমান ভুলগুলো চিহ্নিত করে দেশব্যাপী শিক্ষকবৃন্দের নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থা করবেন যেন শিক্ষকবৃন্দের সতর্কীকরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকের ভুলগুলোকে চিহ্নিত করতে পারে; বিভ্রান্তির শিকার না হয়। এটা এদেশের ৯০ ভাগ মানুষের প্রাণের দাবী।

দুই.

কোন জাতিগোষ্ঠীর শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম তার চিন্তা-চেতনা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে। পৃথিবীর জীবন্ত ও সতেজ সকল জাতিগোষ্ঠী উক্ত বিষয়টি ভাবনায় রেখে তার শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে এবং সে অনুযায়ী জাতীয় পাঠ্যক্রম ঢেলে সাজায়। শিক্ষাক্ষেত্রে যুক্তিহীন পরানুকরণ স্বকীয়তা বিনষ্ট করে জাতিসত্তাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দেয়। প্রায় দু'শ বছর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দাসত্বের পর আমরা স্বাধীন ভূখণ্ডের অধিকারী হয়েছি বটে কিন্তু দাসত্বের ঘৃণ্য মনোভাব আমাদের তেমনই রয়ে গেছে। দুরভিসন্ধিমূলক শিক্ষাসিলেবাস চাপিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভারতবর্ষের নতুন প্রজন্মের কাছ থেকে ইংরেজ-প্রতিনিধি লর্ড ম্যাকলে এটাই আশা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমরা এমন এক পাঠ্যক্রম রেখে গেলাম যার মাধ্যমে এ ভূখণ্ডের শিক্ষার্থীরা রক্তে ও মাংসে, বর্ণে ও আকৃতিতে থাকবে অবিকল ভারতীয়, কিন্তু চিন্তা ও ভাবনায়, মনে ও মানসিকতায় হবে পুরোপুরি ইউরোপিয়ান।' লর্ড ম্যাকলে ভবিষৎদ্রষ্টা ছিলেন না, কিন্তু নিজেদের রোপিত বিষবৃক্ষ ও তার ফল-ফসল সম্পর্কে ছিলেন পূর্ণ ওয়াকিফহাল। লর্ড ম্যাকলেরা এই ষড়যন্ত্র এঁটেছিলেন ভারতবর্ষের ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষকে ঘিরে। কিন্তু উপমহাদেশের মুসলমানদের দুর্ভাগ্য, তাদেরকে নিয়ে ফিরিঙ্গি লর্ড ম্যাকলে'র সঙ্গে এদেশের বৈদ্যবাবুরাও নিজেদের মনে দুরাশার বীজ লালন করেছিল। ম্যাকলে এবং তার দোসর বৈদ্যবাবুদের সেই স্বপ্নসমগ্র এখন স্বাধীন বাংলাদেশের মুসলমানদের জীবনে চরম দুঃস্বপ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে।

বাবুরা সুবিশাল রামরাজ্যের অধিপতি হয়েও প্রায় নব্বই শতাংশ মুসলিম অধ্যুষিত ছোট্ট পরিসরের স্বাধীন বাংলাদেশকে বগলদাবা করে রাখতে প্রথম দিন থেকেই লালায়িত ছিল। আগে কিছুটা রাখঢাক রেখে আর বর্তমানে খুল্লমখোলা তারা এদেশের সব ব্যাপারে নিজেদের মতো করে নাক-মুখ গলিয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার কালিদাস বৈদ্যর[১] বই 'বাংগালীর মুক্তিযুদ্ধের অন্তরালে শেখ মুজিব' পড়ে দেখুন, বাবুদের চিত্তদাহের প্রমাণ পেয়ে যাবেন। বস্তুত বাংলাদেশ এখন লর্ড ম্যাকলে আর বাবুদের রাডারে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এটা বুঝতে বড় কোন ডিগ্রীধারী হওয়া লাগে না। বাংলাদেশের বিভিন্ন ঘটনা-দুর্ঘটনায় রাডারের কথাটি ইতোমধ্যে তারা অকপটেই উচ্চারণ করেছেন। কাজেই এখন আমরা বাবুদের মতো করেই দেখি, তাদের ইচ্ছাতেই চলি-বলি এবং করি-ভাবি। খোঁজ করলে দেখা যাবে, দেশের রাষ্ট্রীয় বড় বড় সব প্রতিষ্ঠানে এখন সংখ্যালঘুরাই সংখ্যাগুরু। প্রধান বিচারপতির আসনটি তাদেরই দখলে। দেশের প্রধান ব্যাংকের নিরাপত্তার দেখভাল তাদেরই হাতে ন্যস্ত এবং রাষ্ট্রীয় বড় বড় সকল পদ ও পদমর্যাদায় তারা বা তাদের অনুগতরাই অধিষ্ঠিত। বলা বাহুল্য আমাদের শিক্ষামন্ত্রণালয়ও তাদের রাডার ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয়। এ প্রতিষ্ঠানটিও এখন রীতিমতো সাহেব-বাবু কিংবা বাবু-সাহেব ও তাদের স্যাঙ্গাতদের দখলে। ফলে শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মুসলমানগণ একই সঙ্গে লর্ড ম্যাকলে এবং বাবুদের হীন আকাঙ্ক্ষার যূপকাষ্ঠে বলি হচ্ছেন। এটা এখন ওপেন সিক্রেট।

তিন.

'অব দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল' যদি গণতন্ত্রের সংজ্ঞা হয় তাহলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জাতীয় শিক্ষানীতিতে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের চিন্তা-ভাবনা, ধর্ম-কর্ম ও চেতনা-বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটা জরুরী। জাতীয় শিক্ষানীতিতে গুটিকতক লোকের ব্যক্তিগত মনোভাবকে পুরো জাতিগোষ্ঠীর

---

[১] 'বাঙ্গালীর মুক্তিযুদ্ধের অন্তরালে শেখ মুজিব' বইয়ের লেখক ডাক্তার কালিদাস বৈদ্য। বইটি সম্পর্কে সাংবাদিক পবিত্র ঘোষ একটি ভূমিকা লিখেছেন, তাতে তিনি বলেছেন '৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় কালিদাস বৈদ্য কলকাতায় ছাত্র ছিলেন। ১৯৫০ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান ফিরে যান পাকিস্তান ভাঙার শপথ নিয়ে। বৈদ্যবাবুর আশা ছিল, পাকিস্তান মুক্ত পূর্ব বাংলা বা বাংলাদেশ ইসলাম মুক্ত হয়ে শুধু বাঙালির দেশ হবে। বাঙালি বলতে বৈদ্যবাবু ইসলাম বা ধর্ম মুক্ত বাঙালিদের মনে করেন।

চেতনা-বিশ্বাস হিসেবে চালিয়ে দেয়ার প্রবণতা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়। দুঃখজনকভাবে আমরা আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে এ বিষয়টিই ঘটতে দেখছি বারবার। যারা নিজেদের গলার রশিকে অন্যের হাতে সঁপে দিয়ে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলছে এবং আবদ্ধ হয়েছে দাসত্বের হক আদায়ের প্রাণপণ প্রতিজ্ঞায় তাদের হাতেই তুলে দেয়া হচ্ছে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের দায়িত্ব। দিল্লি আর ওয়াশিংটনে বৃষ্টি হলে যারা ঢাকায় বসে ছাতা উঁচিয়ে ধরেন তাদের হাতেই অর্পিত হচ্ছে জাতীয় পাঠ্যক্রম প্রণয়নের গুরুভার। নব্বই ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত ভূখণ্ডে এটা অযৌক্তিক, এটা অসহ্য।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর সুরতহাল

নেজামে ইসলাম পার্টির মহাসচিব মাওলানা আব্দুল লতীফ নেজামী তার 'জাতীয় শিক্ষানীতি বনাম ধর্মশিক্ষা' প্রবন্ধে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ সম্পর্কে লিখেছেন– 'আধিপত্যবাদীরা বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের আধিপত্যলিপ্সা চরিতার্থ করতে চায় তাদের এদেশীয় দোসরদের মাধ্যমে। বাংলাদেশ টেক্সট বুক বোর্ডের বইগুলোতে নাস্তিক্যবাদী, ব্রাহ্মণ্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাচেতনা সম্বলিত প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতার সংযোজন তারই সুস্পষ্ট নজির। আর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশের স্কুল, কলেজ ও মাদরাসার পাঠ্যপুস্তক প্রণেতারাও যে আধিপত্যবাদী সংস্কৃতির অন্ধ অনুসারী তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই তারা দেশ-জাতি ও জনগণের স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধ, আদর্শ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, তাহযীব-তামাদ্দুন, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের চেতনা বিধ্বংসী শিক্ষা আইন প্রণয়নে প্রবৃত্ত হয়েছেন। স্বকীয়তার চেতনাকে সঞ্জীবিত রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সচেষ্ট ইসলামী শিক্ষা রহিতকরণের ষড়যন্ত্র, মূলত শিক্ষাকে বিধর্মীয়করণ প্রক্রিয়ারই ধারাবাহিকতা মাত্র। এই শিক্ষানীতি একপেশে, একমুখী, মূল্যবোধহীন, নৈতিকতাহীন, ধর্ম এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য বিরোধী। শিক্ষানীতিতে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদেরকে ইসলাম ধর্ম চর্চা থেকে সরিয়ে অনৈতিকতা ও ব্রহ্মচর্চায় উজ্জীবিত করার প্রয়াস লক্ষণীয়। ধর্ম ও মাদরাসা শিক্ষা সম্পর্কে শিক্ষা আইনে যে প্রস্তাব করা হয়েছে, তা শুধু অনাকাঙ্ক্ষিত এবং চিরায়ত মূল্যবোধের পরিপন্থীই নয়, বরং এদেশের জনগণের লালিত ও ধারণকৃত চেতনার সাথেও অসামঞ্জস্যপূর্ণ। জাতীয় শিক্ষানীতির অধীনে প্রণীত জাতীয় পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যবই থেকে মুসলিম লেখকদের ইসলামভিত্তিক রচনা, গল্প ও কবিতা, মুসলিম ধর্মীয় গুরুদের ওপর লিখিত জীবনী বাদ দেয়ার অভিযোগ সময়োপযোগী চিন্তার বহিঃপ্রকাশ। কেননা সব দেশেই তাদের জাতীয় বীর ও ধর্মীয় গুরুদের ওপর লেখা প্রবন্ধ ও কবিতা স্ব স্ব দেশের পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত থাকে নিজস্ব আদর্শের প্রতিফলন ঘটানোর জন্য। পৃথিবীর সব দেশেরই নিজস্ব আদর্শ রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের স্কুল, কলেজ ও মাদরাসার শিক্ষার সিলেবাস এর ব্যতিক্রম। ফলে শিক্ষা আইনের ব্যাপারে বিভিন্ন মহল থেকে প্রতিবাদ অনিবার্য হয়ে ওঠে। একমুখী শিক্ষার নামে ধর্মীয় শিক্ষা সংকোচনের একপেশে উদ্যোগ অনাকাঙ্ক্ষিত এবং চিরায়ত মূল্যবোধের সম্পূর্ণ পরিপন্থী হিসেবে আখ্যায়িত করে বলা হচ্ছে যে, এসব পদক্ষেপ এদেশের জনগণের লালিত ও ধারণকৃত চেতনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সুদীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত ধর্মীয় শিক্ষার বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করে শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যের সাথে অভিন্নতাবোধ নির্মাণের প্রয়াস হিসেবে ধর্মীয় শিক্ষাকে স্রেফ বৈশিষ্ট্যহীন করে তোলার ষড়যন্ত্র বৈ আর কিছুই নয়। ধর্মীয় শিক্ষার বৈশিষ্ট্যে রদবদল ঘটিয়ে অন্য শিক্ষার সাথে অভিন্ন করে তোলাই শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য বলে মনে করা হচ্ছে। জাতীয় শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ধারায় জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করে প্রজন্ম পরম্পরায় সঞ্চালনের ব্যবস্থা করার কথা বলা হলেও এই সুপারিশে দেশ-জাতি ও জনগণের স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধ, আদর্শ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, রীতি-নীতি, তাহযীব-তামাদ্দুন, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের চেতনাকে সঞ্জীবিত করার ব্যবস্থা নেই। বরং এই শিক্ষানীতিতে স্বকীয়তার চেতনাকে সঞ্জীবিত রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সচেষ্ট ধর্মীয় শিক্ষা বন্ধের পর্যায়ক্রমিক পদক্ষেপ এবং গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকে বিজাতীয়করণ প্রক্রিয়ারই ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শিক্ষানীতিতে শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা, মাদরাসা শিক্ষা, ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা, নারী শিক্ষা, ললিতকলা শিক্ষা, তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা ইত্যাদি বিভিন্ন অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রকৌশল, চিকিৎসা, তথ্য-প্রযুক্তি, নারী, ব্যবসায়, কৃষি, আইন প্রভৃতি সাধারণ ও টেকনিক্যাল বিষয়ে সব রিপোর্টে প্রায় একই সুপারিশ থাকায় মতানৈক্য হয়নি। কিন্তু প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদরাসার বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে ধর্মীয় বিষয়কে ডাউন গ্রেড করে ব্যাপক পরিবর্তন আনায় জনমনে নানা প্রশ্নের উদ্রেক হয়। এসব শ্রেণীর বাংলা সাহিত্যে মুসলিম লেখকদের প্রবন্ধ-নিবন্ধ, গল্প-কবিতা, নাটক প্রভৃতি বিষয় পরিবর্তন করে এমনসব রচনা, গল্প, কবিতা সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যা এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ঈমান-আক্বিদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাই এই পাঠ্যপুস্তক থেকে এসব প্রবন্ধ-নিবন্ধ বাতিলের দাবিতে দেশব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে।

পেশাভিত্তিক দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য ধর্ম শিক্ষা কোনো বাধা নয়। কারণ কুরআন-সুন্নাহয় সব পেশার ধারণা রয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯২১ সালে ব্রিটিশ আমলে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এতদাঞ্চলের লোকদের বিশ্বাস, সংস্কৃতি ও মননের দিকে লক্ষ্য রেখে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ চালু করা হয় এবং ছাত্র-ছাত্রী যোগাড়ের লক্ষ্যে তা পর্যায়ক্রমে কলেজেও সম্প্রসারিত করা হয়। কিন্তু প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনে জাতীয় আদর্শিক চেতনা, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সর্বজনগ্রহণযোগ্য শিক্ষানীতির প্রতিফলন ঘটেনি। বরং ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা বিবর্জিত সেক্যুলার ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তাছাড়া শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে ললিতকলার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ললিতকলা শিক্ষাকে আবশ্যক বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করে শিশুমনে ধর্মহীন চিন্তা-চেতনা সৃষ্টির কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। চিত্রকলার নামে জাতিকে মূর্তিপ্রীতির দিকে পরিচালনা, সঙ্গীত, নৃত্য ও সংস্কৃতির নামে এক ধরনের অপসংস্কৃতির পথে চলার কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। মার্জিত ও রুচিসম্মত ললিতকলা শিক্ষা নির্মল চিত্তবিনোদনের মাধ্যম হতে পারে, কিন্তু এই শিক্ষা কখনো সুরুচিসম্পন্ন নাগরিক গোষ্ঠী তৈরির সহায়ক হতে পারে না।

পাঠ্যপুস্তক ধর্মীয় শিক্ষা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সংবলিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা

পৃথিবীর সব দেশে স্ব ধর্মের মৌলিক শিক্ষা আদর্শমানে এবং পৃথক বিষয়

হিসেবে জাতীয় শিক্ষাক্রমে আবশ্যিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। ধর্মীয় মূল্যবোধসমৃদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় দেশে দেশে। কেননা ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর আচরণগত উৎকর্ষ সাধন এবং জীবন ও সমাজে নৈতিকতা প্রয়োগের মানসিকতা ও চরিত্র গঠন। কেননা ধর্মই হলো মানুষের বিশ্বাসের মৌলিক বিষয়। এর মাধ্যমেই মানবিক গুণাবলী অর্জিত হয়। ছাত্রদের সুকুমারবৃত্তির বিকাশ, নৈতিক উৎকর্ষ সৃষ্টি, সৃজনশীল প্রতিভার উন্মেষ, তাদেরকে সুশিক্ষিত ও মার্জিত করে গড়ে তোলা এবং প্রকৃত মানব সৃষ্টির ক্ষেত্রে ধর্মীয় শিক্ষার বিকল্প নেই। ধর্মীয় শিক্ষা আমাদের চেতনাকে শাণিত, কর্তব্যবোধে উজ্জীবিত, দৃপ্ত ও উদ্দীপ্ত করতে সহায়তা করে। এই শিক্ষাই কেবল চিন্তাভাবনার জগতে বিরাজমান নৈরাজ্যের উন্নতি ঘটাতে, দেশে উন্নত মানবিক জীবন এবং সমাজের মনোভূমিতে শৃঙ্খলা আনতে পারে। কেননা এই শিক্ষা মানুষের অন্তরে পারস্পরিক ভালোবাসা, সাম্য ও মৈত্রীর অনুভূতি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই জাগ্রত করে। পারমাণবিক বোমা আবিষ্কারের পর অধ্যাপক বার্বাস বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার ওপর জোর দিয়ে বলেছেন, 'বাধ্যতামূলকভাবে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অনুশীলন না করলে মানব সভ্যতাকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না'। সারা পৃথিবীতে নিজস্ব ধর্মীয় পটভূমিকে স্মরণে রেখে পাঠ্যপুস্তকের সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলাদেশী জাতিসত্তার মর্মমূলে ধর্মের প্রভাব থাকলেও আমরা আমাদের শিক্ষার সিলেবাসে ধর্মভিত্তিক নৈতিকতাসম্পন্ন রচনা স্থান দিতে লজ্জাবোধ করি। অথচ আমাদের বাংলাদেশিত্ব ও ধার্মিকতাই আমাদের জাতিসত্তার অস্তিত্বের শর্ত। আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের গ্যারান্টি। ধর্ম ছাড়া আমাদের পৃথক জাতিসত্তার সবল ও সফল অস্তিত্ব নির্মাণ সম্ভব নয়। তাই আমাদের পাঠ্যপুস্তকে এমন সব রচনা সন্নিবেশিত করা প্রয়োজন যাতে আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ড-ভিত্তিক এবং জীবনভিত্তিক চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি তৈরি করতে সক্ষম হয়।

ধর্ম থেকেই শিক্ষা উৎসারিত। তাছাড়া সব ধর্মেই মৌলিক অঙ্গ হচ্ছে শিক্ষা। সব ধর্মেই শিক্ষা গুরুত্ব পেয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয়েছে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকেই। ইসলাম ধর্মশিক্ষা তথা জ্ঞান অর্জনের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। পবিত্র কুরআনের প্রথম ওহির শিক্ষা হচ্ছে 'পড়'। ইসলামে শিক্ষাকে প্রত্যেক নর-নারীর জন্য ফরজ (অবশ্যকরণীয়) করা হয়েছে। খ্রিস্টধর্মের অনুসারীরা নৈতিকতাকে বাইবেল থেকে উৎসারিত বলে মনে করে। বেদান্ত বা বৈদিক ধর্মের মূল কথা হচ্ছে জ্ঞান। বৈদিক শব্দের অর্থও হচ্ছে জ্ঞান। বৌদ্ধধর্মে অহিংস জীবনযাপনের কথা বলা হয়েছে। ইহুদিদের ঐতিহ্য ও নৈতিকতা ধর্ম থেকেই উৎসারিত। তাই বিশ্বের উন্নত দেশে ধর্মশিক্ষাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

দেশে দেশে ধর্মশিক্ষা ও আমাদের বাঙালিয়ানা

পশ্চিমা বিশ্বের বহু দেশে খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা চালু রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে ধর্ম শিক্ষার জন্য স্কুল-কলেজ ছাড়াও ওয়াশিংটনে একটি ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটি রয়েছে। এককালের কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নে ৭০ বছর পর আবার ধর্ম শিক্ষা শুরু হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক মহাচীনেও ধর্মীয় শিক্ষা দিতে বাধা নেই। যুক্তরাজ্যে সরকারিভাবে খ্রিস্টধর্ম ও ইহুদি ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীন হওয়ার পর ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু নানা সমস্যার কারণে সে লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। তাই ভারতে ধর্মীয় নীতির ভিত্তিতেই শিক্ষাব্যবস্থা চলছে। ভারতে জৈন স্কুল, বৈশ্য স্কুল, রাজপুত স্কুল চালু আছে। ফ্রান্স ধর্মীয় বিদ্যালয়ে ভর্তুকিও দিয়ে থাকে। জার্মানি ও গ্রিসে অর্থোডক্স খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা চালু আছে। কানাডায় ক্যাথলিক ধর্ম শিক্ষার জন্য বাজেট বরাদ্দ বাধ্যতামূলক। তুরস্কে ধর্ম শিক্ষাকে নিঃশেষ করে দেয়ার কামাল আতাতুর্কের অপপ্রয়াস সফল হয়নি। সৌদি আরবসহ সব মুসলিম দেশে কোনো না কোনোভাবে আল-কুরআন ও ইসলামী শিক্ষা চালু রয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সব দেশে সব সমাজে ধর্মীয় শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা চালু আছে। আর আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোক ধর্মীয় শিক্ষাকে কবর দিতে চায়। তাছাড়া দেখা যাচ্ছে যে, চীন কনফুসীয়-বৌদ্ধ ভিত্তি নিয়ে, জাপান বৌদ্ধ ভিত্তি নিয়ে, ইসরাইল ইহুদি ভিত্তি নিয়ে টিকে আছে। নেপাল হিন্দু ভিত্তি নিয়ে এবং পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া মুসলিম ভিত্তি নিয়ে টিকে আছে। ভারতের ঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষতাও আজ অস্বীকৃত হচ্ছে। এভাবে পৃথিবীতে ভাষা ও অন্যান্য বিষয় ছাড়িয়ে আজ রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ডগত পরিচয়ে জাতিসত্তার ভিত্তি হচ্ছে ধর্ম। অথচ বাঙালিয়ানার নামে আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে হিন্দুত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত করার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। ধর্মীয় শিক্ষায় এদেশের জনগণের বিশ্বাস, আমল-আখলাক, আচার-ব্যবহার, জীবন ধারণ, জীবন-মনন গঠিত হয়। তাই বর্তমান আদর্শিক শূন্যতা দূর করে সৎ, যোগ্য ও দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরির লক্ষ্যে নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শের ভিত্তিতে সর্বস্তরের শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। আর এই নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শের ভিত্তি হবে ধর্মীয় শিক্ষা। উচ্চশিক্ষা, দুনিয়ার যে কোনো স্থান থেকে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা আহরণ করা যাবে, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানকে কাজে লাগানো যাবে, যোগাযোগ-যাতায়াত-বৈষয়িক লেনদেন করা যাবে। তবে জাতিসত্তার ভিত্তি হিসেবে ধর্ম শিক্ষাকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় বোধ-বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা সংস্কার করতে হবে। সংবিধানের পবিত্র বিসমিল্লাহ ও রাষ্ট্রধর্মের আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি ও আইন প্রণয়ন করতে হবে। ধর্মীয়বোধের পটভূমিকে স্মরণে রেখে শিক্ষানীতি সম্পর্কে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। কেননা স্বকীয়তার অন্তঃপ্রেরণায় বাংলাদেশ স্বতন্ত্র। জাতীয় শিক্ষানীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি জাতীয় দলিল প্রণয়নে ব্যাপকভাবে জনগণ, শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের মতামত নেয়ার দরকার।

জোরের জিনিস টেকসই হয় না

উল্লেখ্য, পৃথিবীর যেখানেই জোর করে বিপরীতমুখী শিক্ষানীতি চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, তা টেকেনি, কালের আবর্তে হারিয়ে গেছে। যেমন তুরস্কের ওপর চাপিয়ে দেয়া ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থা টেকেনি। সোভিয়েত নেতৃত্বাধীন পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশেও চাপিয়ে দেয়া লেলিনের ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা স্থায়ী হয়নি। আজ তুরস্কে প্রবর্তিত কামাল আতাতুর্কের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার অস্তিত্ব নেই। তাই বলা যায়, বাংলাদেশেও ধর্মনিরপেক্ষ তথা ধর্মহীন ও সমাজতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা টিকবে না।'

চার.

যেভাবে এবং যাদের হাতে প্রণীত হয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এবং নতুন পাঠ্যপুস্তক

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন, পাঠ্যক্রম প্রস্তুতকরণ এবং তার সংস্কার কাজ অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি বিষয়। এ কর্মযজ্ঞে জাতির ওপর প্রভাব বিস্তারকারী ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ, জাতীয় নেতৃবৃন্দ, শাস্ত্রাভিজ্ঞ, বুদ্ধিজীবি ও জাতির হিতাকাঙ্ক্ষী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পরামর্শ ও সংশোধনী নেয়া একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। কিন্তু আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, আমাদের নতুন শিক্ষানীতি ও জাতীয় পাঠ্যক্রম প্রস্তুত কাজে এর ন্যূনতম খেয়াল রাখা হয়নি।

এ প্রসঙ্গে আব্দুল লতীফ নেজামী সাহেব লিখেছেন,

'...বর্তমান সরকার শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার জন্য ২০০৯ সালে অধ্যাপক কবির চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি জাতীয় শিক্ষা উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করে। সেই কমিটির সদস্যদের অতিমাত্রায় ইহজাগতিকপ্রীতি ও ধর্মবিদ্বেষ সর্বজনবিদিত। তারা স্বজাতির শিক্ষাব্যবস্থাকে দেখেন ব্রাহ্মণ্যবাদী ও নাস্তিক্যবাদী প্রকরণে এবং তারা যে সাম্রাজ্যবাদ, ইহুদিবাদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদের বলয়াবৃত, তা তাদের কৃতকর্মে প্রতিফলিত। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে বিভ্রান্ত বিশ্বাসের অনুবর্তী এসব লোকের উপলব্ধিতে বিজাতীয় সম্প্রকাশ ঘটেছে। তাছাড়া শিক্ষানীতির ব্যাপারে সার্বিক সুপারিশ করার মতো অভিজ্ঞতালব্ধ এবং মতামত দেয়ার ব্যাপারে যোগ্যতা রাখেন এমন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি এই কমিশনে রাখা হয়নি। তাছাড়া মাদরাসা শিক্ষা, ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের ধারক সর্বজনগ্রহণযোগ্য বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাবিদদের সাথে শিক্ষানীতি নিয়ে আলোচনাও করা হয়নি। যাদের সাথে শলাপরামর্শ করা হয়েছে তারা প্রায় সবাই একই মতাদর্শে বিশ্বাসী। অর্থাৎ এ কমিটি বিশেষ মতের অনুসারী লোকদের নিয়ে গঠিত। তাই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনার পরিপন্থী একশ্রেণীর লোকদের নিয়ে গঠিত শিক্ষা কমিটি সম্পর্কে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী ও সুধীজনদের পক্ষ থেকে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয় এবং বিভিন্ন মহল থেকে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনার চেয়ে ক্ষমতাসীনদের নিজস্ব রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রয়াস চালানো হচ্ছে বলে অবস্থাদৃষ্টে অনুমিত হচ্ছে। ইসলামী ভাবধারার মুসলিম লেখকদের প্রবন্ধ-নিবন্ধ, নাটক ও গল্প-কবিতার পরিবর্তে বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে নাস্তিক্যবাদী ও ব্রাহ্মণ্যবাদী ভাবাদর্শের রচনা, গল্প, নাটক ও কবিতা প্রতিস্থাপন তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।'

বিশিষ্ট কবি ও গবেষক এরশাদ মজুমদার অবশ্য রাখঢাক না করে এই অতিমাত্রায় ইহজাগতিকপ্রেমী, ধর্মবিদ্বেষী, বিশেষ মতের অনুসারী এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনা পরিপন্থী লোকদের-কে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'বাংলাদেশের হিন্দুরা এখন মেজরিটির অধিকার ভোগ করে থাকেন। সর্বত্রই তাদের অবস্থান ৩০ থেকে ৪০ শতাংশর মতো। সেদিন শুনলাম শিক্ষা বিভাগে বিভিন্ন উচ্চ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পদে অবস্থান করছেন হিন্দুরা। ধর্মমুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার জন্য শুরু থেকেই নুরুল ইসলাম নাহিদকে মন্ত্রী করা হয়েছে। কারণ, তিনি একজন মৌলবাদী ধর্মমুক্ত মানুষ। তিনি নিজের বিশ্বস্ত লোকজনকেই সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার দিয়েছেন। আসলে এটাই ছিল বৈদ্যবাবু ও তার বন্ধুদের স্বপ্ন, যা এখন বাস্তবায়িত হতে চলেছে। ধর্মমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হলে হিন্দু বা ভারতের আদর্শ বা লক্ষ্য বাস্তবায়িত হবে একথা বৈদ্যবাবু ও তার সমর্থকেরা ভালো করেই জানেন। আমি কিন্তু বৈদ্যবাবু, তার বন্ধু ও দিল্লির এই নীতিকে সমর্থন করি। কারণ, কেউ যদি নিজ ও তার গোত্রের এবং গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করেন তাতে দোষের কিছু নেই। কারণ নিজ স্বার্থ রক্ষা মানুষের অধিকার। সংবিধানও তা সমর্থন করে। প্রশ্ন হলো দেশের ৯০ শতাংশ মানুষ তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারছেন কিনা? না পারলে তা কার ব্যর্থতা? পলাশীতে নবাবের সৈন্য, রসদ, শক্তি ইংরেজের চেয়ে বহু গুণ বেশি ছিল। কিন্তু জয় হয়েছিল ইংরেজদের। সুতরাং জয়লাভের জন্য মেজরিটি আর মাইনরিটির বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বুদ্ধি ও কৌশল।' (দৈনিক নয়াদিগন্ত, ১৮জুলাই, ২০১৬)

সাংবাদিক জনাব মুরাদ হোসেন 'নবম শ্রেণীর বাংলা বইয়ে মানহীন কবিতা, সমালোচনায় সংসদীয় কমিটি' শিরোনামে রিপোর্ট করেছেন, '...সভা শেষে কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন বলেন, নবম শেণীর বাংলা বইয়ে মোট ৩১টি কবিতা রয়েছে যার মধ্যে ভারতীয় কবিদের ১৩টি। কেন এতগুলো কবিতা ভারতীয় কবিদের তা শিক্ষামন্ত্রী ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে জানতে চেয়েছেন কমিটি।

...সংশ্লিষ্টরা অভিযোগ করেছেন, নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকটি যাচাই-বাছাইয়ে বিভিন্ন স্তরে কমিটি তৈরি করা হলেও কমিটির একাধিক সদস্যের পরামর্শ ও অনুমতি ছাড়াই বইটির কারিকুলাম চূড়ান্ত করা হয়েছে। তারা জানান, নির্বাচকদের মনগড়া ও একশ্রেণীর প্রভাবশালী ব্যক্তিদের খুশি করতেই জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) নবম-দশম বাংলা বইটি তৈরি হয়েছে। বইয়ের কবিতা, গদ্য, প্রবন্ধ, নাটক পরিবর্তনের কথা বলা হলেও বইয়ে বাংলা সাহিত্যের মান ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে তারা দাবি করেছেন। তারা বলেন, দেশের জাতীয় কবিদের কবিতা বাদ দিয়ে নির্বাচন করা হয়েছে নিম্নমানের কবিতা। অন্যদিকে এসব অভিযোগ অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন বইটির প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ আবূ সায়ীদ।

সম্পাদক কমিটির সহযোগী, অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক অভিযোগ করে বলেন, কমিটিতে সহযোগী সম্পাদনার দায়িত্ব পাওয়ার পরও তাকে বাদ দিয়ে গোপনে সভা করে প্রধান সম্পাদক ও সমন্বয়কারী কারিকুলাম নির্বাচনের সকল কাজ সমাপ্ত করেছেন। পাণ্ডুলিপি চূড়ান্ত করতে কমিটির সদস্যদেরও কোন মতামত নেয়া হয়নি। তিনি বলেন, বিভিন্ন মহলের সুপারিশে নবম-দশম শ্রেণীর বইয়ের পাণ্ডুলিপি চূড়ান্ত হওয়ায় এমন ঘটনা ঘটেছে। মানহীন লেখা নির্বাচন করা হয়েছে এমন মন্তব্য করে তিনি বলেন, যেসব লেখা নির্বাচন করা হয়েছে তা কোমলমতি শিক্ষার্থীদের কী শিখাবে তাই প্রশ্ন। এই বইটি পড়ে শিক্ষার্থীরা বাংলা শিক্ষার উপর মনোযোগ হারিয়ে ফেলতে পারে। বিখ্যাত কবিদের কবিতা বাদ দিয়ে শিক্ষা সচিবের মানহীন কবিতাও বাছাই করা হয়েছে এই বইয়ে। (উক্ত অভিযোগ সত্য হলে ধরে নেয়া যায়, অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হককে হাতির বাইরের দাঁতের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। সম্ভবত এ উদ্দেশ্যেই ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর বাংলা বই যথাক্রমে চারুপাঠ, সপ্তবর্ণা ও সাহিত্য কণিকা'য় সংকলক ও সম্পাদকমণ্ডলীর তালিকায় তাকে সবার ওপরে রাখা হয়েছে। আর নবম-দশম শ্রেণীর 'মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য'-এ সম্পাদক হিসেবে দুই নম্বরে

রাখা হয়েছে। তো কাজ যা করার তা 'ওপরের' নির্দেশে আব্দুল্লাহ আবূ সায়ীদের নেতৃত্বে নিরঞ্জন অধিকারী, বিশ্বজিৎ ঘোষ, সৌমিত্র শেখর এবং তাদের দোসররা সেরেছেন কিন্তু দায়টা পড়েছে মাহবুবুল হকের ঘাড়ে।)

...তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করে প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবূ সায়ীদ বলেন, *আমার যা ভালো মনে হয়েছে তাই করেছি*। তিনি এর বেশি মন্তব্য করতে রাজি হননি।' (পাঠক, আব্দুল্লাহ আবূ সায়ীদের 'আমার' শব্দটি লক্ষ্য করুন। কোন কাজ যথাযথ ও নির্ভুলভাবে সম্পাদন করতেই তো কমিটি করা হয় নাকি? সে হিসেবে সম্পাদনা কমিটির প্রধান আব্দুল্লাহ আবূ সায়ীদের তো 'আমাদের' বলা উচিত ছিল। তা না করে তিনি 'আমার' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এতে মাহবুবুল হকের অভিযোগই সুপ্রমাণিত হয়েছে।)

তাছাড়া এ অভিযোগও উঠেছে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠান ইসলামবিরোধী শিক্ষানীতি-২০১০-কে শিক্ষা আইনরূপে জারি করতে তোড়জোড়ও করছে। বিতর্কিত প্রস্তাবিত নীতির ওপর মতামত দিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে মাত্র এক সপ্তাহ (৩ থেকে ১০ এপ্রিল) সময় দেয়া হয়। এত কম সময়ের মধ্যে সাধারণ মানুষের পক্ষে জানা সম্ভবও নয়, তাদের ছেলেমেয়েকে কী পড়ানোর জন্যে ঘটা করে কী আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে? সেখানে কী থাকছে কিংবা সেটা পড়ে তার ছেলেমেয়ে আদৌ মুসলিম থাকবে কিনা, এ সম্পর্কে যাচাই করার সুযোগও থাকছে না। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এ আশঙ্কা মোটেও অমূলক নয় যে, প্রণীত পাঠ্যসূচি ছাত্র-ছাত্রীদের মুসলিম পরিচয় ভুলিয়ে দেবে এবং তা গভীর চক্রান্তমূলক। **(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)**

লেখক: ইমাম ও খতীব, বাইতুর রহমান বড় জামে মসজিদ, বছিলা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

(৩৭ পৃষ্ঠার পর : নারীর ঠিকানা)

অর্থ : শেষ যামানায় এমন কিছু লোক পাওয়া যাবে যারা হাওদা সদৃশ জিনের উপর (গাড়িতে) আরোহণ করবে এবং এ বাহনে তারা মসজিদের গেটে অবতরণ করবে। তাদের নারীগণ কাপড় পরা সত্ত্বেও নগ্ন হবে। তারা হবে উটের পিঠের মত উত্থিত চুলের খোঁপা বিশিষ্ট। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ৭০৮৩)

উম্মতকে সতর্ক করার জন্য চৌদ্দশত বছর পরের চিত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বেই এঁকে দিয়েছিলেন।

কথা বলার রয়েছে নির্দিষ্ট নীতিমালা

নারীদের বিভিন্ন প্রয়োজনে পর-পুরুষের সাথে কথা বলতে হয়। অনেক সময় ফোনে কিংবা মার্কেট-বাজারে পর-পুরুষের মুখোমুখি হতে হয়। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় এক্ষেত্রে কোমল ও মিষ্টি ভাষা বলাই ভদ্রতা। বড় বড় শপে বা কোম্পানিতে আগত লোকদের সাথে সৌজন্য বিনিময়ে মিষ্টভাষী মেয়েদের বাছাই করে চাকুরী দেয়া হয়। বরং মেয়েদের এসব কাজে ব্যবহার করা পুঁজিবাদীদের ব্যবসায়িক পলিসি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ইসলামের দৃষ্টিতে নারীরা এমন সস্তা কাজে ব্যবহারের জন্য নয়। পর-পুরুষের সাথে আকর্ষণীয় ভাষায় কথা বলা ইসলামী শরীয়তে বিধিবদ্ধও নয়। কুরআনের নির্দেশ হল, পর-পুরুষের সাথে যদি কথা বলতেই হয়, তাহলে তা ভাষার চমৎকারিত্ব ফুটিয়ে নয় বরং সাদামাটাভাবে প্রয়োজনীয় কথাটুকু শুধু বলে দিবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ.

অর্থ : তোমরা কোমল কণ্ঠে কথা বলো না, পাছে অন্তরে ব্যাধি আছে এমন লোক লালায়িত হয়ে পড়ে। (সূরা আহযাব- ৩২)

অপরিচিত নর-নারী একে অপরের প্রতি চোখ তুলে তাকাবে না

নর-নারীকে নিষ্কলুষ, পবিত্র রাখার জন্য ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান হল, তারা যেন একে অপর থেকে দৃষ্টি অবনত রাখে। হাদীসের ভাষায় দৃষ্টি হল শয়তানের তীর। ফিতনার সূচনা এখান থেকে শুরু হয়। যিনা-ব্যভিচারের মাধ্যমে তার সমাপ্তি ঘটে। ইসলামের এই একটি নির্দেশ না মানার কারণে মেয়েরা রাস্তাঘাটে অপদস্ত হচ্ছে, যুবক ছেলেদের টিজের শিকার হচ্ছে, ছেলে-মেয়েরা অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছে।

হাজারো সামাজিক বিশৃঙ্খলার কেন্দ্র হচ্ছে দৃষ্টি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, অর্থ : (হে নবী!) মুমিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান হিফাযত করে। এটাই তাদের জন্য (পাপকর্ম ও ব্যভিচার থেকে) অধিক রক্ষাকারী।

এবং মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। নিজেদের ভূষণ অন্যদের কাছে প্রকাশ না করে, যা আপনিই প্রকাশ পায় তা ব্যতীত এবং তারা যেন তাদের ওড়নার আঁচল বক্ষদেশে নামিয়ে দেয়। (সূরা নূর- ৩০, ৩১)

ফিরে আসুন পথে

নিবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে সন্তানকে যোগ্য, বলিষ্ঠ এবং সুস্থ চিন্তার ধারক রূপে গড়ে তোলা ছিল নারীর প্রধান দায়িত্ব। যাতে দেশ ও জাতি চরিত্রহীন মেধাশূন্য জাতিতে পরিণত না হয়। পশ্চিমাদের ষড়যন্ত্রে সেই নারী আজ পথে ঘাটে মার্কেটে পণ্যের বিজ্ঞাপনে নারীও যেন একটি পণ্য। নানামুখী প্রচার প্রসারে নারীরা তাদের স্বকীয়তা ও জাত্যভিমান হারাতে বসেছে। তাদেরকে আধুনিকতার নামে জাহেলিয়াত এবং স্বাধীনতার নামে পরাধীনতার সবক দেয়া হচ্ছে। তাদের দৃষ্টিতে লালিত্য অঙ্গভঙ্গি ও আপত্তিকর পোশাক পরিধান প্রগতির মূল সূত্র। এভাবে যদি চলতে থাকে অল্পদিন পর আর নিষ্কলুষ নারী খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই নারী সমাজের প্রতি আহ্বান, ফিরে আসুন পথে, প্রকৃত মুক্তির পথে। আমরা চরিত্রবান সমাজ চাই, নিষ্কলুষ নারী চাই। সুস্থ চিন্তার জাতি চাই।

লেখক : খতীব, বাইতুর রহমান জামে মসজিদ হেমায়েতপুর, ঢাকা।

(৯ পৃষ্ঠার পর : কুরবানী)

১০. গরীবদের কাছ থেকে কুরবানীর গোশত ক্রয় করা

কুরবানী দাতার জন্য তার নিজ কুরবানীকৃত পশুর গোশত বিক্রি করা নাজায়েয। বিক্রি করলে উক্ত বিক্রিত গোশতের মূল্য গরীবদেরকে সদকা করা ওয়াজিব। তবে অন্যের কুরবানীর পশুর গোশত হাদিয়া পাওয়ার পর হাদিয়াপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য তা অন্যত্র বিক্রি করার অবকাশ রয়েছে। এবং অন্যদের জন্যও উক্ত ব্যক্তি থেকে এ গোশত ক্রয় করা বৈধ আছে।

(সহীহ বুখারী; হা.নং ১৪৯৫, সহীহ মুসলিম; হা.নং ১১৫৯, আলবাহরুর রায়িক ২/২৪৫ বাবুল মাসরাফ, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৬/৩৯৪)

লেখক : শিক্ষার্থী, উলূমুল হাদীস বিভাগ, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

সোজাপথ ও বাঁকাপথ

কথিত এক খতীব সম্পর্কে

গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর

ফাতাওয়া বিভাগ : জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

বরাবর,
হযরত মুফতী সাহেব দা.বা.

১. আমাদের মসজিদের খতীব সাহেব কোন মাযহাব অনুসরণ করেন না। তিনি একজন লা-মাযহাবী লোক। বিভিন্ন সময়ে তিনি বিশ্ববরেণ্য উলামায়ে কেরামকে নিয়ে বাজে মন্তব্য করেন। এমনকি চার মাযহাবের শ্রেষ্ঠ ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর ভুল ধরার মত সাহস দেখিয়েছেন। তিনি ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর সরাসরি সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, ইমাম আবূ হানীফা রহ. একজন সাধারণ ব্যবসায়ী ছিলেন এবং দীর্ঘ দিন ফারসী ভাষায় নামায আদায় করেছেন।

২. কোন লা-মাযহাবী ইমামের পিছনে মাযহাব অনুসারী মুসল্লীগণের নামায হবে কিনা?

৩. চার মাযহাবের সংমিশ্রণ করা জায়েয কিনা?

৪. তিনি সফরে গেলে যোহর ও আসর নামায এবং মাগরিব ও ইশার নামায একসাথে পড়েন এবং অন্যদেরকেও একসাথে পড়ার পরামর্শ দেন। এভাবে নামায আদায় করা জায়েয হবে কি?

৫. বিতর নামায কত রাকাআত? খতীব সাহেব নিজে বিতর নামায এক রাকাআত আদায় করেন এবং মুসল্লীদেরকেও এক রাকাআত নামায আদায় করার পরামর্শ দেন। মসজিদে এক রাকাআত বিতর নামায প্রচলন করার চেষ্টা চালাচ্ছেন।

৬. বর্তমান খতীব মসজিদে হালাল টাকা দান করার কথা বলেন। আবার তিনি নিজেই চলচিত্র অভিনেতার নিকট থেকে টাকা নিয়ে মসজিদের জন্য জায়নামায ক্রয় করেন। এটা জায়েয হবে কি?

৭. মহিলাদের মসজিদে এসে রমাযান মাসের ই'তিকাফ (শেষ দশদিন) করা জায়েয আছে কি?

৮. জুমু'আ, তারাবীহ এবং ঈদের নামায মহিলাদের মসজিদে এসে জামাআতের সহিত আদায় করা জায়েয আছে কি?

অনুগ্রহপূর্বক উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর কুরআন এবং হাদীসের আলোকে প্রদান করে বাধিত করবেন।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর

এক. মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মতিক্রমে চার মাযহাব হক। এদের মাঝে জরুরী আকীদা বিশ্বাস ও কুরআন হাদীসের অকাট্য বিধানাবলীতে ও আদর্শগত উল্লেখযোগ্য কোন মতবিরোধ নেই। অনুরূপভাবে সাহাবা ও তাবেয়ীদের সর্বসম্মত কোন বিষয়েও মাযহাবসমূহে মতপার্থক্য নেই। মাযহাবসমূহে পূর্ববর্তী সময়ের যে সকল বিধানে মতবিরোধ হয়েছে তা সম্পূর্ণরূপে সাহাবা ও তাবেয়ীগণের কর্ম ও মতের পার্থক্যের উপর নির্ভরশীল। আর পরবর্তীতে যে সকল বিষয়ে তাদের মতপার্থক্য হয়েছে তা সবই নির্ভরযোগ্য দলীলের উপর নির্ভরশীল। এ সকল মাযহাবের মাসাইল ও সেগুলোর দলীল-প্রমাণাদি নিয়ে শত শত বছর গবেষণা হয়েছে। গবেষণা করেছেন কুরআন, সুন্নাহ, তাফসীর ও হাদীস শাস্ত্রের বড় বড় ইমামগণ। তাদের কেউ কোন মাযহাবকে ভ্রান্ত কিংবা অগ্রহণযোগ্য বলেননি।

কুরআনে পাকের সূরা নিসার ৫৯নং আয়াত

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

অর্থ : হে ইমানদারগণ আল্লাহর আনুগত্য কর, আনুগত্য কর তাঁর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা দায়িত্বশীল তাদের। (সূরা নিসা- ৫৯)

তো এখানে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে যে 'উলুল আমর' তথা দায়িত্বশীলদের আনুগত্য করতে বলা হয়েছে, মাযহাবের ইমামগণও যে সেই উলুল আমরের অন্তর্ভুক্ত এ ব্যাপারে কেউ দ্বিমত করেননি। আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. তার বিখ্যাত তাফসীরগ্রন্থে লিখেন,

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عباس: وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ يَعْنِي: أَهْلَ الْفِقْهِ وَالدِّينِ. وَكَذَا قَال مُجَاهِدٌ، وَعَطَاءٌ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَأَبُو الْعَالِيَةِ: {وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ} يَعْنِي: الْعُلَمَاءَ. وَالظَّاهِرُ -وَاللَّهُ أَعْلَمُ- أَنَّ الْآيَةَ فِي جَمِيعِ أُولِي الْأَمْرِ مِنَ الْأُمَرَاءِ وَالْعُلَمَاءِ، كَمَا تَقَدَّمَ. تفسير القرآن العَظيم- ٣٨٤/٢ط.دارالحديث

বরং সূরা নিসার ১১৫নং আয়াতে

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ

অর্থ: যে কেউ রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং মুসলমানদের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফেরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। (সূরা নিসা- ১১৫)

এ আয়াতে 'সাবীলুল মুমিনীন' (তথা মুমিনদের পথ) এবং হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবের এক কিতাব সুনানে ইবনে মাজাহ'র হাদীসে আছে,

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ.

অর্থ : রাসূলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মত গোমরাহীর উপর একমত হবে না। সুতরাং যখন মতানৈক্য দেখবে তখন তোমাদের করণীয় হল 'সাওয়াদে আযম' তথা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বড় দলের সাথে থাকা। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ৩৯৫০)

এখানে 'সওয়াদে আযম' তথা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত উম্মতের বড় দল বলতে সমষ্টিগতভাবে চার মাযহাব ও মাযহাবের অনুসারীগণই। এ কথার উপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিম্নে এ মর্মে মনীষীদের কিছু বক্তব্য তুলে ধরা হলো-

১. হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ. বলেন,

أَن هَذِه الْمذاهب الْأَرْبَعَة الْمُدَوَّنَة المحررة قد اجْتمعت الْأمة أَو من يعْتد بِهِ مِنْهَا على جَوَاز تقليدها إِلَى يَوْمنَا هَذَا، وَفِي ذَلِك من الْمصَالح مَا لَا يخفى لَا سِيمَا فِي هَذِه الْأَيَّام الَّتِي قصرت فِيهَا الهمم جدا، وأشربت النُّفُوس الْهوى وأعجب كل ذِي رَأْي برأيه-

অর্থ : গোটা উম্মাহর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, বর্তমানে মাযহাব চতুষ্টয়ের তাকলীদ বৈধ হবে। কেননা মানুষের মনোবলে যেমন ভাটা পড়েছে তেমনি প্রবৃত্তির গোলামী হৃদয়ের পরতে পরতে শিকড় গেড়ে বসেছে। ব্যাপক হারে খোদপছন্দী দেখা দিয়েছে। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ১/১৪৫)

২. ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ مُوَالَاةِ اللَّهِ تعالى وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَالَاةُ الْمُؤْمِنِينَ كَمَا نَطَقَ بِهِ الْقُرْآنُ. خُصُوصًا الْعُلَمَاءُ, الَّذِينَ

هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ جَعَلَهُمْ اللَّهُ بِمَنْزِلَةِ النُّجُومِ, يُهْتَدَى بِهِمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى هِدَايَتِهِمْ وَدِرَايَتِهِمْ.

অর্থ : মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব হল, আল্লাহ ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একাত্মতার পর মুমিনগণের সাথে একাত্মতা পোষণ করা। যেমনটি কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ করে ঐ সকল আলেমগণের সঙ্গে যারা নবীগণের উত্তরসূরী তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নক্ষত্রতুল্য বানিয়েছেন, যাদের দ্বারা জলে ও স্থলের অন্ধকারের হিদায়াত পাওয়া যায়। গোটা মুসলিম উম্মাহ তাদের হিদায়াত প্রাপ্তি ও দীনের বিজ্ঞ হওয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছে।

দ্রষ্টব্য : রফউল মালাম আন-আইম্মাতিল আলামের ভূমিকা। (এই রিসালাটি মাজমূয়া ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়ায় [২০/২৩২ পৃষ্ঠা] সন্নিবেশিত আছে)

সুতরাং সাহাবায়ে কেরামের কর্ম ও মতের পার্থক্যের উপর নির্ভরশীল এবং কুরআন-সুন্নাহর নির্ভরযোগ্য সূত্রের ভিত্তিতে সৃষ্ট মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে যারা কোন মাযহাবকে ভুল বলবে তারা আকীদাগতভাবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত থেকে খারিজ এবং যারা মাযহাব অনুসরণ বর্জন করে লা-মাযহাবী হবে তারা কুরআনে পাকের সূরা নিসার ৫৯নং আয়াতের বিরুদ্ধাচরণকারী। তেমনিভাবে সূরা নিসার ১১৫নং আয়াতে বর্ণিত সাবিলুল মুমিনীন হতে বিচ্যুত এবং সুনানে ইবনে মাজাহ'র ৩৯৫০নং হাদীসে বর্ণিত সাওয়াদে আযম থেকে বিচ্ছিন্ন। নিম্নে এ মর্মে উম্মতের শীর্ষ ব্যক্তিদের কিছু বক্তব্য তুলে ধরা হল-

১. শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী রহ. তার সুবিখ্যাত গ্রন্থ ইকদুল জীদ এর ৩১ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

اعْلَم أَن فِي الْأَخْذ بِهَذِهِ الْمذَاهب الْأَرْبَعَة مصلحَة عَظِيمَةوَفِي الْإِعْرَاض عَنْهَا كلهَا مفْسدَة كَبِيرَة وَنحن نبين ذَلِك بوُجُوه–

অর্থ : চার মাযহাবের তাকলীদ করার মাঝে যেমন বিরাট কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তেমনি তা বর্জন ও লঙ্ঘনের মাঝে বিরাট ক্ষতি ও অকল্যাণ রয়েছে।

২. বিশ্ববরেণ্য আলেমে দীন শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ তাকী উসমানী দা.বা. 'তাকলীদ কী শরয়ী হাইসিয়্যাত' কিতাবে মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. এর বরাত দিয়ে লিখেছেন,

مذھب اربعہ کی پابندی کی دوسری وجہ حضرت ساہ صاحب یہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صل اللہ علیہ و علم کااسادہے کہ ا یبعواا السواد الاعظم یعنی سوادا عظم کی پیروی کرو اور جب ان چار مذھب کے سوا دوسرے برحق مذھب مابود ہوگئے تو انہی مذھب کا اتباع سواد اعظم کا اتباع ہے اور ان سے باہر جانا سواد اعظم کی مخالفت ہے-

অর্থ : যখন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত চার মাযহাব ছাড়া আর কোন মাযহাব বাকী নেই তো এ চার মাযহাবের অনুসরণই সওয়াদে আযমের অনুসরণ এবং এর থেকে বের হওয়া হলো, সাওয়াদে আযম তথা বড় দলের বিরুদ্ধাচরণ। (তাকলীদ কি শরয়ী হাইসিয়্যাত; পৃষ্ঠা ৮৪)

দুই. হযরত ইমাম আবূ হানীফা রহ. মুজতাহিদ ইমামগণেরও ইমাম ছিলেন। আর দীনের সকল জরুরী বিষয়ে চূড়ান্ত পাণ্ডিত্যের অধিকারী না হলে কেউ মুজতাহিদ হতে পারে না; মুজতাহিদগণের ইমাম হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর ইলমী অবস্থান ও তাকওয়া-পরহেযগারীতে শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর যোগ্যতার আগাম ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كَانَ الدِّينُ عِنْدَ الثُّرَيَّا، لَذَهَبَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ فَارِسَ أَوْ قَالَ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ حَتَّى يَتَنَاوَلَهُ

অর্থ: হযরত আবূ হুরায়রারা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইলমে দীন যদি সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ তারকাতেও থাকে (অর্থাৎ যা অর্জন করা সহজলব্ধ নয়) পারস্যের এক ব্যক্তি তা উদ্ধার করে আনবে। (সহীহ মুসলিম হা.নং ২৫৪৬, সহীহ বুখারী হা.নং ৪৮৯৭, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ৩২৬১)

قال الحافظ المحقق الجلال السيوطى هذا اصل صحيح يعتمد عليه في البشارة بابى حنيفة وفي الفضيلة التامة–

অর্থ : (বর্ণিত হাদীসের ব্যাপারে) শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী বিশিষ্ট ফকীহ ও হাফিযুল হাদীস জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. (মৃত ৯১১হি.) এ মর্মে মন্তব্য পেশ করেছেন যে, এই হাদীসটি ইমাম আবূ হানীফা রহ. সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী ও তার প্রকৃত মর্যাদা সম্পর্কে একটি সহীহ ও নির্ভরযোগ্য ভিত্তি। (আলখাইরাতুল হিসান; পৃষ্ঠা ২৩, তাবয়ীযুস সহীফা; পৃষ্ঠা ২১)

এছাড়া তার যোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতার সাক্ষ্য দিয়েছেন ইমাম শাফেয়ী রহ., ইমাম মালেক রহ., আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের মত ইমামগণ। আর তার ব্যক্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে স্বতন্ত্র বই লিখেছেন–

১. শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী এবং হাদীস শাস্ত্রের অন্যতম ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. (মৃত ৭৪৮হি.) কিতাবের নাম 'মানাকিবে আবী হানীফা ওয়া সাহিবাইহি'।
২. শাফেয়ী মাযহাবের আরেকজন জগদ্বিখ্যাত আলেম, হাদীস ও হাদীস শাস্ত্রের অন্যতম সংকলক, বিশ্বব্যাপী সমাদৃত তাফসীরে জালালাইন এবং আলইতকান ফী উলূমিল কুরআনের লেখক জাললুদ্দীন সুয়ূতী রহ. (মৃত ৯১১ হি.) তিনি লিখেছেন– 'তাবয়ীযুস সহীফা বি মানাক্বিবিল ইমাম আবী হানীফা।'
৩. হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী এবং হাদীসের ও হাদীস শাস্ত্রের যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম ইবনে আব্দুল বার (মৃত ৪৬৩ হি.) লিখেছেন– 'আল ইন্তিকা ফি ফাজায়িলিল আয়িম্মাতুস ছালাছাতিল ফুকাহা, মালেক ইবনে আনাস, মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস, আশশাফেঈ ওয়া আবি হানীফাতান নু'মান'।

   এছাড়া আরো অনেকেই ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর ব্যক্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সর্ম্পকে কিতাব লিখেছেন। এখানে শুধু নমুনা হিসেবে অন্য মাযহাবের কয়েকজন প্রসিদ্ধ ও সর্বজনমান্য ব্যক্তিবর্গের লেখার কথা উল্লেখ করা হলো।

বস্তুত ইমাম আবূ হানীফা রহ. ছিলেন ইলমী জগতের দ্বি-প্রহরের সূর্য। ইলমী জগতের সকল নির্ভরযোগ্য আলেমগণ তাকে শ্রদ্ধাভরে 'ইমাম আ'যম' হিসাবে স্মরণ করে। অতীতে যে দু'চারজন লোক অজ্ঞতা বশত কিংবা প্রতিহিংসা বশত ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর সমালোচনা করেছে, উম্মতে মুহাম্মাদী তাদের সমালোচনা প্রত্যাখ্যান করেছে। বস্তুত সে সমালোচকদের মুখে কালি লেপন করার জন্যই মাযহাবের ভিন্নতা সত্ত্বেও হাদীস ও হাদীস শাস্ত্রের উপরোল্লেখিত ইমামগণ ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর ব্যক্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের উপর স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছেন।

সুতরাং বর্তমানে কেউ যদি ইমাম আযম আবূ হানীফা রহ. সম্পর্কে সেই

প্রত্যাখ্যাত মিথ্যা ইতিহাস রটনা করেন এবং সেটাকে উপাদেয় হিসাবে গ্রহণ করেন, তাহলে তিনি নিজেকে আলেম পরিচয় দেয়ার যোগ্যতা হারাবেন। কেননা পরিভাষায় আলেম মানে তো শুধু জ্ঞানী নয় (ইবলিসও তো অনেক বড় জ্ঞানী তবুও আলেম নয়।) বরং সত্যকে জানা এবং মানাটাও আলেম হওয়ার জন্য শর্ত। কথিত খতীব সাহেব আলেম হয়ে থাকলে কী কারণে তিনি ইমাম যাহাবী রহ., ইবনে হাজার রহ., ইবনে কাসীর রহ., সুয়ূতী রহ.ও ইবনে আব্দুল বার রহ. এর মত হাজারো ইমামগণ কর্তৃক স্বীকৃত ও প্রশংসিত ইমামের সমালোচনা করতে যাবেন? সমালোচনা তো ইমাম বুখারী রহ. ও ইমাম মুসলিম রহ.-সহ বড় বড় ইমামগণেরও হয়েছে কিন্তু কোন আলেম কি তা গ্রহণ করেছেন? কেউ গ্রহণ করেননি।

তিন. কথিত খতীব সাহেব ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে একজন সাধারণ ব্যবসায়ী ছিলেন বলে যে তাচ্ছিল্য করতে চেয়েছেন, সেটাও তার মূর্খতার প্রমাণ। কেননা ইমাম আবূ হানীফা কোন সাধারণ ব্যবসায়ী ছিলেন না। কিয়ামত পর্যন্ত যত সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ী দুনিয়াতে ব্যবসা করবেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের হাশর নবীগণের সঙ্গে হবে মর্মে ঘোষণা করেছেন– ইমাম আবূ হানীফা রহ. ছিলেন তাদেরও ইমাম। সম্ভবত খতীব সাহেবের সীমিত জ্ঞানের কারণে নিম্নোক্ত ঘটনাটি তার অজানা রয়েছে।

وَقَالَ النخعِي: حَدَّثَنَا الحُسَيْن بن الحكم الحِبري، قَال: حَدَّثَنَا عَليّ بن حفص البَزّاز، قَالَ: كَانَ حفص بن عَبْد الرَّحْمَن شريك أَبي حنيفة، وَكَانَ أَبُو حنيفة يجهز عَلَيْهِ، فبعث إِلَيْهِ فِي رفقة بمتاع، وأعلمه أن فِي ثوب كذا وكَذا عيبا، فإذا بعته فبين، فباع حفص المتاع ونسي أن يبينَ، ولم يعلم ممن باعه، فلمَّا علم أَبُو حنيفة تصدق بثمن المتاع كله.

অর্থ: আলী ইবনে হাফস বলেন, হাফছ ইবনে আব্দুর রহমান আবূ হানীফা রহ. এর ব্যবসায়িক অংশীদার ছিলেন। আবূ হানীফা রহ. পণ্য-সামগ্রী প্রস্তুত করতেন। তো (একদিন) ইমাম আবূ হানীফা রহ. তাকে বণিকদলের সাথে পণ্য-সামগ্রী দিয়ে পাঠালেন এবং জানিয়ে দিলেন যে, কাপড়ের অমুক অমুক জায়গায় ক্রটি রয়েছে। বিক্রি করার সময় তা স্পষ্টভাবে বলে দিবে। কিন্তু হাফস তা বিক্রি করার সময় ক্রটির কথা বলতে ভুলে যান এবং ক্রেতা কে ছিল সেটাও তার স্মরণ ছিল না। ইমাম আবূ হানীফা রহ. এ সম্পর্কে অবগত হয়ে পণ্যের পুরো মূল্যই ছদকা করে দিলেন। (তারীখে বাগদাদ ১৩/৩৫৬, ইমাম সুয়ূতী রহ. কৃত তাবয়ীযুস সহীফা; পৃষ্ঠা ১০৬, ইমাম যাহাবী রহ. কৃত মানাকীবুল ইমাম আবী হানীফা রহ.; পৃষ্ঠা ৪১)

তাছাড়া ব্যবসা তো স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও করেছেন এবং হালাল ব্যবসাকে সর্বোত্তম উপার্জন বলেছেন। খতীব সাহেব কি এই ইলমটুকুও রাখেন না?

আর 'ইমাম আবূ হানীফা রহ. দীর্ঘ দিন ফার্সী ভাষায় নামায পড়েছেন ' আমাদের ধারণায় কথিত খতীব সাহেব এমন নির্লজ্জ ও মিথ্যা কথা বলেননি। কারণ এমন মিথ্যা কথা একজন সাধারণ মুসলমানও বলতে পারে না। কিন্তু আমাদের ধারণা যদি ভুল হয়, তাহলে এমন খতীবের পিছনে যারা নামায পড়বে, তাদের সকলের নামায শঙ্কায় পড়ে যাবে। কারণ মিথ্যা বলা কবীরা গুনাহ, মিথ্যাবাদী সর্ব-সম্মতিক্রমে ফাসেক।

মোটকথা, প্রশ্নপত্রের প্রথম অনুচ্ছেদের বক্তব্য সঠিক হলে, কথিত খতীব সাহেব একজন চরম পর্যায়ের অজ্ঞ ও মূর্খ লোক। ইলমে দীন ও দীনের ধারক বাহক উলামায়ে দীনের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। অথবা চরম পর্যায়ের কোন গোমরাহ দলের সদস্য এবং একজন অসৎ আলেম। তার পড়ালেখার যোগ্যতা থাকলে নিম্নোক্ত আরবী বক্তব্যগুলো পড়ে অনুবাদ করে দিতে বলবেন। এরপর জিজ্ঞেস করবেন, কী কারণে ইমাম আবূ হানীফা রহ. সম্পর্কে এসকল ইমামের মন্তব্য ও বক্তব্য তার পছন্দ হল না, তিনি কোন প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করেছেন এবং কারা তার শিক্ষক ছিলেন? আমাদের জানামতে পৃথিবীতে এমন কোন দীনী প্রতিষ্ঠান নেই, যেখানে ইমাম আবূ হানীফা রহ. সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণকারী ও এমন মিথ্যাবাদী ছাত্র তৈরী হয়।

মন্তব্যসমূহ

١. قال الحافظ الذهبى: اشْتُهِرَ مَذْهَبُ الأَوْزَاعِيِّ مُدَّةً وَتَلاَشَى أَصْحَابُهُ، وَتَفَانَوْا. وَكَذَلِكَ مَذْهَبُ سُفْيَان وَغَيْرِهِ مِمَّنْ سَمَّيْنَا وَلَمْ يَبْقَ اليَوْمَ إِلاَّ هَذِهِ المَذَاهِبُ الأَرْبَعَة. (سير أعلام النبلاء:٨/٩٢)

٢. وقال الامام الربانى سيدى عبد الوهاب شعرنى:ومذهبه-اى مذهب ابى حنيفة اول المذاهب تدوينا واخرها انقراضا كما قاله بعض اهل الكشف قد اختاره الله ماما لدينه وعباده و لم يزل اتباعه في زيادة في كل عصرالى يوم القيامة لو حبس احدهم وضرب على ان يخرج عن طريقه ما اجاب فرضى الله عنه وعن اتباعه وعن كل من لزم الادب معه ومع سائر الائمة (الميزان الكبرى-١/٥٩)

٣. وقال شمس الأئمة السرخسى: كان الأمام ابو حنيفة اعلم اهل عصره بالحديث ولكن لمراعاة شرط كمال الضبط قلت روايته (اصول الفقه للسرخسى:١/٣٥٠)

٤. ولقد قال ملك المحدثين امام الجرح والتعديل يحي الن معين: العلماء اربعة: الثورى وابو حنيفة ومالكوالازاعى- (البداية والنهاية: ١٠/١١٦)

٥. .قال الحافظ الذهبى:أَفْقَهُ أَهْلِ الكُوْفَةِ عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُوْدٍ، وَأَفْقَهُ أَصْحَابهمَا: عَلْقَمَةُ، وَأَفْقَهُ أَصْحَابِهِ: إِبْرَاهِيْمُ، وَأَفْقَهُ أَصْحَاب إِبْرَاهِيْمَ: حَمَّادٌ، وَأَفْقَهُ أَصْحَاب حَمَّادٍ: أَبُو حَنِيْفَةَ، وَأَفْقَهُ أَصْحَابِهِ أَبُو يُوْسُفَ، وَانْتَشَرَ أَصْحَابُ أَبِي يُوْسُفَ فِي الآفَاق، وَأَفْقَهُهُم: مُحَمَّدٌ، وَأَفْقَهُ أَصْحَاب مُحَمَّدٍ: أَبُو عَبْدِ الله الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى. : (سير أعلامَ النبلاء-٥/٢٣٦)

٦. قال عبد الرشيد النعمانى في مقدمة تبييض الصحيفة صـــ١٤-١٥

فقد عد الحافظ ابن تيمية ابا حنيفة وصاحبيه أبا يوسف ومحمد ابن الحسن فىأَهْلُ الْعِلْمِ الَّذِينَ يَبْحَثُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَنِ الْعِلْمَ، وَلَيْسَ لَهُمْ غَرَضٌ مَعَ أَحَدٍ، بَلِ يُرَجِّحُون قوْلَ هَذَا الصَّاحِب تَارَةً، وَقَوْلَ هَذَا الصَّاحِب تَارَةً، بحَسَبَ مَا يَرَوْنَهُ مِنْ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ وسرد اسماء قرنائهم وصرح في موضع اخر من كتابه هذا أن أبا حنيفة واصحابه ممن له في الأمة لسان صدق من علمائها. (منهاج السنه ٤/٧٧)

٧. .قال ابن حجر: مناقب الامام أبي حنيفة كثيرة جدا فرضي الله تعلى عنه واسكنه الفردوس آمين. (تهذيب التهذيب: ٨/٥١٨)

٨. قال ابن حجر:أبو حنيفة العمان بن ثابت الامام المشهور. (تقريب التهذيب: ٢/٧١٤)

٩. قال عبد الرشيد النعمانى:لفظ الأمام اذا اطلق ولم يقيد في كتب الجرح والتعديل من اعلى مراتب التوثيق وهو من ثقة او متقن او ثبت اوعدل- (مكانة الأمام أبى حنيفة:صـــ١٢٢)

لنصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على ما حملوا القيام به وتنبيههم عند الغفلة وسد خلتهم عند الهفوة وجمع الكلمة عليهم ورد القلوب النافرة إليهم ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد وتقع النصيحة لهم ببث علومهم

ونشر مناقبهم وتحسين الظن بهم. (فتح الباري شرح صحيح البخاري : ٥٧)

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর

বাস্তবে বর্তমান দুনিয়াতে কোন লা-মাযহাবী নেই। কথিত লা-মাযহাবীদের কেউ যেহেতু মুজতাহিদ নয় কাজেই তারাও মুকাল্লিদ। কেউ ঘড়ির মেকার শাইখ আলবানীকে ইমাম মানে, আর কেউ ডাক্তার জাকির নায়েক, ডাক্তার মতিয়ার কিংবা প্রফেসর আসাদুল্লাহ গালিব-জাতীয় লোকের মতাদর্শে চলে। বাস্তবে এটাও একটা জগাখিচুড়ি মার্কা মাযহাব। অন্যথায় তারা কেউ নবী নন যে, তাদের মতামত ও ব্যাখ্যা বিশ্বাস করলেই আহলে হাদীস হওয়া যাবে, আর চার মাযহাবের ইমামগণের মতামত ও ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে ভিন্ন কোন প্রাণী তৈরী হবে।

তা সত্ত্বেও কোন গাইরে মুকাল্লিদ যদি উম্মতের শ্রদ্ধাভাজন উলামা ও ফুকাহাগণের শানে বেয়াদবী না করে, মিথ্যা অপবাদ না রটায়, উম্মতের মাঝে ফিতনা সৃষ্টি না করে, পেশাব করে ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার না করে তাৎক্ষণিক পানি ব্যবহার করত পরিধেয় বস্ত্রে পেশাব মাখতে অভ্যস্ত না হয়, যে সকল বিষয়ে উম্মতের ইজমা হয়ে গেছে সেগুলোতে ভিন্নমতের জন্ম না দেয় এবং নামায পড়ানোর শর্তাবলী তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাহলে এমন লোকের ইমামতিতে নামায হয়ে যাবে। কিন্তু যে লা-মাযহাবী বেয়াদব, মিথ্যাবাদী, ফিৎনাবাজ, পেশাবের পর কুলুখ ব্যবহার না করে পানি ঢেলে দেয়ায় বিশ্বাসী হয় এবং নিঃশব্দে নিম্নবায়ু ত্যাগ করলে উজু ভঙ্গ হয় না মনে করে এবং ইজমা-কিয়াস অস্বীকারকারী হয় তাহলে তাকে ইমাম বানানো শরীয়ত ও সুস্থ বিবেক কোনোটার আলোকেই বৈধ নয়।

দলীলসমূহ-

১. وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ لَا يَسْتَخِفُّ بِحَقِّهِمْ إِلَّا مُنَافِقٌ، ذُو الشَّيْبَةِ فِي الْإِسْلَامِ، وَالْإِمَامُ الْمُقْسِطُ، وَمُعَلِّمُ الْخَيْرِ. (جامع بيان العلم وفضله: ١/٥٤٣)

২. عن ابى هريرة مرفوعا :وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم. وفي رواية: إذا قلت لأخيك ما فيه فقد اغتبته، وإذا قلت ما ليس فيه فقد بهته. أي: قلت عليه البهتان وهو كذب عظيم : (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح-٤/٦٦٧)

৩. الفاسق: من فعل كبيرة، أوداوم على صغيرة (٢). وقد صرح الحنفية والشافعية بجواز الاقتداء بالفاسق مع الكراهة، وقال الحنابلة وهو رواية عند المالكية: لا تصح إمامة فاسق بفعل، كزان وسارق وشارب خمر ونمام ونحوه، أواعتقاد، (الموسوعة الفقهية الكويتية-٦/٣٦)

৪. فقد كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم والعلماء بعدهم رحمهم الله يختلفون في المسائل الفرعية ولا يوجب ذلك بينهم فرقة ولا تهاجرا لأن هدف كل واحد منهم هو معرفة الحق بدليله، فمتى ظهر لهم اجتمعوا عليه ومتى خفي على بعضهم لم يضلل أخاه ولم يوجب له ذلك هجره ومقاطعته وعدم الصلاة خلفه، فعلينا جميعا معشر المسلمين أن نتقي الله سبحانه وأن نسير على طريق السلف الصالح قبلنا في التمسك بالحق والأخوة الإيمانية وعدم التقاطع والتهاجر من أجل مسألة فرعية قد يخفى فيها الدليل على بعضنا فيحمله اجتهاده على مخالفة أخيه في الحكم. (مجموع فتاوى بن باز- ١١/١٤٢-١٤٣)

৫. ومنهم من يختلف معهم في الاجتماعيات وتجويز سب السلف وامثال ذلك وحكمهم كاهل البدعة حيث يكره الاقتداء بهم تحريما. (امداد الفتاوى ١٨٣٧٦)

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর

কুরআন সুন্নাহর সুস্পষ্ট নির্দেশনা অনুযায়ী অ-মুজতাহিদের জন্য কোন মুজতাহিদকে অনুসরণ করা জরুরী। মুজতাহিদ একাধিক হলে যে এলাকায় যে মুজতাহিদের অনুসারী উলামা ও ফুকাহা বিদ্যমান, সে এলাকার বাসিন্দাদের ঐ মুজতাহিদের ইজতেহাদ অনুসরণ করা জরুরী। এটা সুস্থ বিবেক এবং শরীয়ত উভয়েরই দাবি। যেমন কোন ব্যক্তি এমন এলাকায় সফরে গেল, যেখানকার কেবলার দিক তার জানা নেই। তার জন্য শরীয়তের নির্দেশ হল, সে নিকটস্থ কোন মুসলমানকে জিজ্ঞেস করে নামায আদায় করবে। এ ক্ষেত্রে একাধিক লোক তাকে ভিন্ন ভিন্ন দিকে কেবলার কথা বললে সে তাদের মধ্য থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য কোন একজনের কথা অনুযায়ী পূর্ণ নামায আদায় করবে। এতে তার নামায হয়ে যাবে। কিন্তু সে যদি চারজনের কথায় চার রাকাআত নামায চারদিকে ফিরে আদায় করে তাহলে শরীয়ত মতে তার নামায বাতিল বলে গণ্য হবে। এমনিভাবে গোটা ইসলামী শরীয়ত চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাযের মতই একটা প্যাকেজ। এজন্য সাধারণ অবস্থায় একজন অ-মুজতাহিদের জন্য একাধিক মাযহাব অনুসরণ করা জায়েয নেই। কেননা একাধিক মাযহাব অনুসরণের অর্থই হল, আসলে সে কাউকেই মানে না বরং নিজেকে মুজতাহিদ ইমামদের চেয়েও বড় ইমাম মনে করে। আর এ যামানায় যে ব্যক্তি নিজেকে মুজতাহিদ ইমামদের চেয়েও বড় ও যোগ্য মনে করবে সে পাগল ছাড়া কিছুই নয়।

অতীতে যাদের লাখ লাখ হাদীস মুখস্থ ছিল তারাও নির্দিষ্ট মতাযহাবের অনুসারী ছিলেন। হাদীসশাস্ত্রের প্রবাদ পুরুষ আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক, ইমাম ত্বহাবী, ইবনে হাজার, ইবনে কাসীর, ইবনে রূশ্দ, ইমাম নববী, ইবনে রজব, ইবনে আব্দিল বার, ইবনে কাইয়্যিম রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ যারা ছিলেন হাদীস শাস্ত্রের প্রবর্তক ও হাদীসের ব্যাখ্যাকার, সহীহ-যঈফ নির্ধারণকারী এঁরাসহ অতীতের জগদ্বিখ্যাত আলেমগণ নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসরণ করেছেন। যেমন, সৌদি আরবের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আলেম শাইখ সালিহ ফাওযান বলেন,

هاهم الأئمة من المحدثين الكبار كانوا مذهبين فشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم كانا حنبليين والامام النووي وابن حجر شافعيين والامام الطحاوي كان حنفيا وابن عبد البر كان مالكيا.

অর্থ : বড় বড় হাদীস বিশারদ ইমামগণ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. ও ইবনুল কায়্যিম রহ. ছিলেন হাম্বলী, ইবনে হাজার রহ. ও ইমাম নববী রহ. ছিলেন শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী, ইমাম তহাবী রহ. ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী, ইবনু আব্দিল বার রহ. ছিলেন মালেকী মাযহাবের অনুসারী। (ইনাআতুল মুসতাফিদ শরহু কিতাবিত তাওহীদ ১/১২)

তো এসকল জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ যখন নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসরণ করেছেন তখন যে ব্যক্তি দু'চারখান হাদীসের কিতাব পড়ে বা অনুবাদ অধ্যয়ন করে নির্দিষ্ট মাযহাব ছেড়ে সকল মাযহাবের সহীহ-শুদ্ধ মতগুলো অনুসরণ করার দাবি করবে সে নিশ্চয় মানসিক রোগী, তার চিকিৎসা করানো জরুরী।

অবশ্য ঠেকা বশত স্থান, কাল, পাত্র ভেদে নির্দিষ্ট কোন মাসআলায় বিজ্ঞ আলেমগণ অন্য মাযহাবের কোন সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করার পরামর্শ দিলে জনসাধারণের জন্য সে ক্ষেত্রে আলেমগণের সিদ্ধান্তক্রমে ত গ্রহণ করার অনুমতি আছে। **(২৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)**

ঐতিহ্যবাহী জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া'র স্বপ্নদ্রষ্টা, যুগশ্রেষ্ঠ রাহনুমা, উত্তর-পূর্ব বাংলার জনসাধারণের প্রাণপ্রিয় ধর্মগুরু, এদেশের ধর্মপ্রাণ জনগোষ্ঠীর দরদী অভিভাবক

হৃদয়ের স্পন্দন শাইখ নূরুদ্দীন গহরপুরী রহ.

মাওলানা শফীক সালমান

চোখের সামনে থাকলে মানুষ যাদের কদর বোঝে না, মূল্যায়ন করে না কিন্তু চোখের আড়াল হওয়ার পর বুক চাপড়ায়, হা-হুতাশ করে– নিভৃতচারী আলেমে দীন, ওলীকুল শিরোমনি, সাহেবে কাশফ, মাজযূব বুযুর্গ শাইখুল হাদীস আল্লামা নূরুদ্দীন গহরপুরী রহ. তাদের অন্যতম।

হালকা-পাতলা শ্যামবর্ণের দেহাবয়ব, জাগ্রত হৃদয়, সদাতৎপর এক অশীতিপর তরুণ যেন। সেই নবযৌবন থেকে শতায়ুর পথে ধাবমান মানুষটি বৃহত্তর সিলেট ও মোমেনশাহী অঞ্চলের মাটি, মানুষ ও প্রকৃতির বড় আপনজন এবং তাদের দরদী রাহবার ছিলেন। চোখে তার ঈগলের দৃষ্টি। অন্তরে স্রষ্টার ধ্যান। মুখে প্রীতিমাখা নামের যিকির। গোটা অস্তিত্ব সদা নিমজ্জিত মাওলা পাকের প্রেমের সমুদ্রে। তাওহীদী জনতার হৃদয়ে খোদা প্রেমের স্বর্গীয় ঝংকার তোলাই যেন তার নেশা। সকালে সিলেট, বিকেলে মোমেনশাহী, সন্ধ্যায় জামালপুর, মাঝরাতে টাঙ্গাইল, শেষরাতে গাজীপুর, বাদ ফজর ঢাকা– এই সফরসূচী ছিল তার হর-হামেশা। এ ধরনের একটা সফরের কথা চিন্তা করলে তাগড়া জোয়ানের গায়েও জ্বর এসে যায়। অথচ এই আশি বছরের বৃদ্ধ প্রায় প্রতি রাতেই এমন দীর্ঘ ও কষ্টকর সফর করতেন। আল্লাহ তা'আলাও তার প্রিয় এই দা'য়ী বান্দাকে রূহানী শক্তি দান করে অকল্পনীয় সাহায্য করেছেন। অচেনা অজানা স্থানে কোন রাহবার ছাড়াই যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে যেতেন। মাহফিলে কখনো শোনা যেত তিনি বহুদূরে আছেন। তার উপস্থিতির ব্যাপারে আয়োজকগণ হতাশ। শ্রোতারা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ দেখা যেত পাগড়ী মাথায় লাঠি হাতে মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছেন মর্দে মুজাহিদ গহরপুরী রহ.।

অবহেলিত জনপদের সরলমনা মানুষ– শিক্ষা সংস্কৃতির ছোঁয়া থেকে অনেক দূরে যাদের অবস্থান– এ জাতীয় ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের প্রাণপ্রিয় ধর্মগুরু ও লোকশিক্ষক ছিলেন শাইখ গহরপুরী রহ.। তাকওয়া, তাহারাত, কর্তব্যবোধ, হামদর্দী, নিষ্ঠা ও খাঁটিত্বের বিচারে তিনি যুগের শ্রেষ্ঠতম সাধক জীবন্ত এক কিংবদন্তী।

জন্ম ও শৈশব

বাংলার আধ্যাত্মিক রাজধানী, ওলী-আউলিয়ার পুণ্যভূমি খ্যাত সিলেট জেলার বালাগঞ্জ উপজেলার শিওরখাল (মোল্লাপাড়া) গ্রামে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রসিদ্ধ বুযুর্গ মাওলানা যহুরুদ্দীন রহ. এর ঘরে উদ্ভাসিত হন দীনের এই জ্যোতি (নূরুদ্দীন)।

তা'লীম-তরবিয়ত

তিনি শিশুকালেই পিতৃহারা হন। অতঃপর মমতাময়ী মায়ের স্নেহছায়ায় বেড়ে ওঠা আর শিক্ষায় হাতেখড়ি। একসময় স্থানীয় সুলতানিয়া মকতবে ভর্তি করা হয়। এরপর ইছামতি ও পূর্বভাগ জামালপুর মাদরাসায় কিছুদিন লেখাপড়া করেন। সে সময় শাইখুল ইসলাম মাদানী রহ. এর বিশিষ্ট খলীফা শাইখে বাঘা মাওলানা বশীরুদ্দীন রহ. গহরপুর এলাকায় গেলে হুযূরের বাড়িতে অবস্থান করতেন। এভাবে একদিন তার মা তাকে শাইখের হাতে তুলে দিয়ে অভিভাবকত্ব গ্রহণের আবেদন করলেন। শাইখ সানন্দে তাকে গ্রহণ করে বাঘা মাদরাসায় এনে ভর্তি করে দিলেন। সেখানে লেখাপড়ার পাশাপাশি তিনি শাইখের খাদিম হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। খিদমতের ফাঁকে ফাঁকে রাত জেগে তিনি একাকী পবিত্র কুরআন হিফয করেন।

এরপর শাইখ তাকে দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি করে দেন। কঠোর তপস্যার সাথে ধর্মীয় জ্ঞান ও শিক্ষার বাহ্যিক ও অন্তর্গত উভয় দিকে তিনি ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ২৬ বছর বয়সে প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে দাওরায়ে হাদীস সমাপন করেন। অতঃপর আরো এক বছর হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রে উচ্চতর গবেষণা করেন। তিনি স্বীয় প্রতিভা, শিষ্টাচার এবং উন্নত চরিত্র মাধুর্যের মাধ্যমে উস্তাদদের মন জয় করে নেন। বিশেষত শাইখুল ইসলাম মাদানী রহ. এর ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভে ধন্য হন। তার অন্যান্য উস্তাদদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন হাকীমুল ইসলাম কারী তৈয়ব রহ., শাইখুল আদব মাওলানা ই'জায আলী রহ., মাওলানা ইবরাহীম বালিয়াবী রহ., মাওলানা ফখরুল হাসান মুরাদাবাদী রহ., মাওলানা মি'রাজুল হক রহ. প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য উলামায়ে কেরাম।

আধ্যাত্ম-সাধনা

তিনি ফারেগ হওয়ার পর কুতবে আলম হযরত মাদানী রহ. এর হাতে বাইয়াত হন এবং তার ঘনিষ্ট সহচর ও সফরসঙ্গী হিসেবে আধ্যাত্মিকতার উন্নত স্তরে আরোহন করেন। তার কর্মস্থল বাংলাদেশে হওয়ায় শাইখের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাই হযরত মাদানী রহ. এর নির্দেশে তার বাংলাদেশী প্রবীণ খলীফা মৌলভীবাজারের মাওলানা হাবীবুর রহমান রহ. শাইখে রায়পুরীর হাতে বাইয়াত হন ও খিলাফত লাভ করেন।

বর্ণাঢ্য কর্মজীবন

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে শাইখুল হাদীস হিসেবে তিনি কর্মজীবনে পদার্পণ করেন। বরিশাল জেলার পাঙ্গাসিয়া সরকারি মাদরাসা কর্তৃপক্ষ একজন দক্ষ শাইখুল হাদীস চেয়ে দারুল উলূম দেওবন্দে আবেদন করেছিলেন। হযরত মাদানী রহ. গহরপুরী হুযূরকে পাঠিয়ে দেন। তিনি দেখতে তেমন সুদর্শন বা আকর্ষণীয় ছিলেন না। তাই তাকে দেখে দায়িত্বশীলদের মনপূত হল না। পুরাতনদের মাঝে তার প্রতি অনীহাভাব স্পষ্ট হয়ে উঠলো। এক পর্যায়ে তাকে উদ্বোধনী সবকে বসানো হল। জটিল ও কঠিন প্রশ্নবানে জর্জরিত তেজস্বী তরুণ গহরপুরী আরবীতে একের পর এক উত্তর দিতে লাগলেন। তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার গভীরতায় ধীরে ধীরে সকলের মনে জমাটবাঁধা অসন্তোষের বরফ গলতে লাগল। পরে সকলে আনুষ্ঠানিকভাবে দুঃখ প্রকাশও করছিল। কিন্তু এ হীরক মানবটিকে তারা বেশিদিন ধরে রাখতে

পারেনি। ছয় বছর পর ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে পাড়ি জমান মোমেনশাহীর ঐতিহ্যবাহী বালিয়া মাদরাসায়। সেখানে দু'বছর শাইখুল হাদীসের দায়িত্ব পালন করে তিনি মাটির টানে ফিরে আসেন নিজ গ্রামে। গড়ে তোলেন বিশাল দীনী ইদারা। প্রথমে দাওরায়ে হাদীস দিয়ে শুরু করে পরবর্তীতে মিশকাত এবং ধারাবাহিকভাবে নিচের দিকের জামাআতগুলো চালু করেন।

জিনদের তা'লীম তরবিয়ত

হুযূরের দরসে জিনরাও অংশগ্রহণ করত। একদিন তিনি হঠাৎ হাদীসের দরস বন্ধ করে পাশের জমিতে গিয়ে দু'টি সাপকে বেদম প্রহার করলেন। কারণ জানতে চাওয়া হলে বললেন, ওরা দু'টি জীন। পড়তে আসে। প্রায়ই ঝগড়া করে। আজ সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। তাই শাস্তি দিয়ে এলাম।

জাতীয় অভিভাবকত্ব গ্রহণ

১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মনোনীত হওয়ার মাধ্যমে কওমী আলেম সমাজের তথা গোটা মুসলিম জনগোষ্ঠীর সর্বোচ্চ অভিভাবকের আসনে সমাসীন হন।

মানবতার সেবায় মাজযূব দরবেশ

শাইখ গহরপুরী রহ. দেশব্যাপী ওয়ায-নসীহতের পাশাপাশি মানবতার সেবা করতেন। পার্থিব বিভিন্ন ধরনের বিপদগ্রস্ত মানুষ তার দরবারে ছুটে আসত। তিনি কখনো অর্থ দিয়ে কখনো ঝাড়-ফুঁক, তাবীয-কবজ করে দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতেন। সপ্তাহের শনিবার ও মঙ্গলবার হুযূরের বাড়িতে দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তবৃন্দ তেল-পানি নিয়ে ছুটে আসত। দীর্ঘ লাইন ধরে তারা অপেক্ষা করত। তাই হুযূর দেশের যে প্রান্তেই যেতেন এ দু'দিন বাড়িতে চলে আসতেন। এ সময় খুব বেশি আমল করার কারণে মাজযূব হয়ে যেতেন। তিনি বলতেন, শনিবার-মঙ্গলবারে আমি মানুষ চিনি না। কেউ পীড়াপীড়ি করলে লাঠিপেটা করতেন। অনেকে ইচ্ছাকৃতভাবে লাঠির আঘাত খেতে মাথা পেতে দিত বা এমন কাজ করত যাতে হুযূর লাঠিপেটা করেন। ক্ষেত্রবিশেষে কেউ কেউ রক্তাক্ত হয়েছে। অনেক নামী দামী লোকও লাঠিপেটা খেয়েছেন বরকত লাভের আশায়।

কথিত আছে, একবার স্থানীয় সংসদ সদস্য দেখা করতে এসে ধর্মীয় লেবাস না থাকায় বেধড়ক পিটুনীর শিকার হয়েছিলেন। তিনি ভুল বুঝতে পেরে পরবর্তীতে পাঞ্জাবী-টুপি পরে দেখা করতে আসতেন।

রাহমানিয়া ও গহরপুরী হুযূর : দেহ ও আত্মার অলৌকিক সমন্বয়

জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার প্রধান মুফতী ও শাইখুল হাদীস আল্লামা মুফতী মনসূরুল হক দা.বা. বলেন, ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে জামি'আ মুহাম্মাদিয়ার সালানা জলসায় হযরত গহরপুরী রহ. কে দাওয়াত করা হয়। মাদরাসার পক্ষ হতে হুযূরের জন্য খানার ইন্তিযাম করা হল। এদিকে আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেটের দুই কর্ণধারের একজন আলহাজ নূর হোসেন কোম্পানী গাড়ী নিয়ে হাযির। তারা দু'ভাই আলহাজ মুহাম্মাদ আলী সাহেব ও নূর হোসেন সাহেব গহরপুরী হুযূরের মুরীদ ছিলেন। হুযূর তাদের বাসায় রাত্রি যাপন করতেন। মুহাম্মাদিয়ায় হুযূরের আগমনের কথা জেনে হাজী মুহাম্মাদ আলী সাহেব নূর হোসেন সাহেবকে পাঠিয়েছিলেন হুযূরকে আনার জন্য। কিন্তু মাদরাসা কর্তৃপক্ষও হুযূরকে ছাড়তে চাচ্ছেন না। তখন হুযূর প্রজ্ঞাপূর্ণ ফয়সালা দিলেন। নূর হোসেন সাহেবকে বললেন, যদি ওয়াদা দেন যে, আপনি এই মাদরাসার একজন স্থায়ী ডোনার হবেন তাহলে আমি আপনার পক্ষ হতে অনুমতি চেয়ে নিব। নূর হোসেন সাহেব এ প্রস্তাবে সানন্দে রাজি হয়ে গেলেন এবং নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা অনুদানের ঘোষণা দিলেন।

জামি'আ রাহমানিয়ার গোড়াপত্তন

হযরত গহরপুরী রহ. একদিন তিন শতাব্দির ঐতিহ্যের ধারক, কালের সাক্ষী ঐতিহাসিক সাত মসজিদে ফজরের নামায আদায় করেন। নামায শেষে হাজী মুহাম্মাদ আলী সাহেবকে বললেন, ভাই! আমি স্বপ্নে দেখেছি, এই স্থানে (সাত মসজিদের পশ্চিম কোণ ঘেঁষা ডোবার দিকে ইঙ্গিত করে) অনেক আলেম-উলামা যাতায়াত করছেন। এখানে একটা মাদরাসা হবে। জমিটির মালিক ছিলেন হাজী সাহেবরা দুই ভাই। উভয়েই হুযূরের মুরীদ। তাই তিনি উভয়কে নির্দেশ দিলেন জমিটি মাদরাসার জন্য দিয়ে দিতে। তারা হুযূরের আদেশ পালনার্থে মাদরাসার নামে জমিটি দান করলেন।

মুফতী সাহেব হুযূর বলেন, জামি'আ মুহাম্মাদিয়ায় আমাদের কিছু সমস্যা হচ্ছিল। বিষয়টি গহরপুরী হুযূরের জানা থাকায় তিনি ঐ জমিটি আমাদেরকে দিতে বললেন। আমরা মুহাম্মাদিয়া ছেড়ে চলে আসলাম। শুরু হল নব উদ্যমে পথচলা। ঐতিহাসিক সাত মসজিদকে বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল ঐতিহ্যবাহী জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া। গহরপুরী হুযূরই রাহমানিয়ার স্বপ্নদ্রষ্টা। রাহমানিয়া একটি দেহ; গহরপুরী তার আত্মা। রাহমানিয়া একটি ইতিহাস; তিনি এর রচয়িতা।

রাহমানিয়ার দুর্দিনের কাণ্ডারী

প্রতিষ্ঠাকালীন শিক্ষাসচিব, বর্তমান মুহতামিম আল্লামা হিফজুর রহমান মুমিনপুরী সাহেব দা.বা. বলেন, ২০০১ খ্রিস্টাব্দে দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে রাহমানিয়ার মূল ভবন বৈধ কর্তৃপক্ষের হাতছাড়া হয়ে যায়। পরিচালনা পর্ষদ সিদ্ধান্ত নেন, পার্শ্ববর্তী টিনশেডে অস্থায়ীভাবে রাহমানিয়ার শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখার। কিন্তু মূলধারার এই ধারাবাহিক কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করতে আমাদেরকে বেফাকভুক্ত না করার জোর তদবীর শুরু হয়। বেফাক অফিসে জরুরী মীটিং আহ্বান করা হয়। গহরপুরী রহ. তখন বেফাকের সভাপতি ছিলেন। সব মীটিংয়ে তিনি অংশগ্রহণ না করলেও আমাদের অসহায়ত্বের সংবাদ পেয়ে ছুটে আসেন। হুযূরের সভাপতিত্বে বৈঠক আরম্ভ হয়। পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক গোটা মজমা একজোট হয়ে দাবি করে যে, এক নামে দু'টি মাদরাসা নিবন্ধন করা যাবে না। দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পর গহরপুরী রহ. প্রজ্ঞাপূর্ণ ফয়সালা দিলেন। তিনি উল্টো প্রশ্ন করলেন, দু'বছর আগে পার্শ্ববর্তী একমসজিদে একই নামে আরেকটি প্রতিষ্ঠান চালানো হয়েছিল কিভাবে? উত্তর এল, সেখানে একটি শব্দ বৃদ্ধি করা হয়েছিল। হুযূর বললেন, এখানেও পার্থক্য করার জন্য আলী নূর রিয়েল এস্টেট শব্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এরপরও যদি আপনাদের আপত্তি থাকে, তাহলে নতুনটার নামের সাথে আলী অ্যান্ড নূর শব্দটি বন্ধনীতে থাকবে। আমাদেরকে হুযূর ডেকে বললেন, আপনাদেরকে محفوظ بين القوسين তথা দুই বন্ধনীর মাঝে সংরক্ষিত করে দিলাম।

কাশফ ও কারামত

গহরপুরী হুযূর যে সাহেবে কাশফ বুযুর্গ ছিলেন তা সর্বজনবিদিত। অনেক কথা এমনও শোনা যায়, যা অবিশ্বাস্য মনে হওয়া স্বাভাবিক।

(২৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

এ যুগের মাসায়েল

অমুসলিমদের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শনের ইসলামী পদ্ধতি

মাওলানা সাঈদুয্‌যামান

ভারতের উত্তর প্রদেশের প্রসিদ্ধ জেলাশহর সাহারানপুর থেকে দেওবন্দগামী ট্রেনে উঠেছিলাম। গন্তব্য ঐতিহ্যবাহী দীনী বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দ। পাশের আসনটিতে বসেছিলেন মীরাঠের এক ভদ্রলোক। পরিচয়ের পর নানা প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলাপচারিতা। আলোচনায় তাওহীদ-শিরক, আল্লাহ-ভগবানও বাদ গেল না। ইসলাম সম্পর্কে তার জানা শোনার কথাটাও তিনি বললেন। একপর্যায়ে বেশ উৎসাহ নিয়েই বললেন, আমার এক প্রতিবেশী মুসলমান বন্ধু আছে। আমরা দু'জনে খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মুসলমানদের ঈদে আমরা তাদের বাড়ীতে যাই। আমাদের পূজো-দিওয়ালীতে সে-ও সপরিবারে আমাদের বাড়ীতে আসে। ভদ্রলোকের কথাগুলো ভালোই লাগছিল। কিন্তু শেষের কথাটিতে চমকে উঠলাম। বর্তমান সময়ে প্রায় সব এলাকাতেই মুসলমানদের সঙ্গে অমুসলিমদের বসবাস। এরা কখনও মুসলমানদের প্রতিবেশী, কখনও বাল্যবন্ধু, কখনও সহপাঠী, আবার কখনও কলিগ বা বিজনেস পার্টনার। অনেকে জানতে চান এদের সঙ্গে সৌজন্য প্রদর্শনের ইসলামী নিয়ম-পদ্ধতি কী? অনেকে আবার নিয়ম-পদ্ধতির খোঁজ-খবর করার পক্ষপাতি নন। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হল, হোক অমুসলিম তারাও তো আমাদের মতোই মানুষ। কাজেই তাদের সঙ্গে উদারতা প্রদর্শনে এতো নিয়ম-নীতির বালাই কেন?

সন্দেহ নেই, অমুসলিমদের সঙ্গে সদাচরণ প্রশংসনীয় এবং এতে আপত্তিরও কিছু নেই। কিন্তু সদাচরণ যখন ইসলামী আক্বীদা-বিশ্বাসের গণ্ডি অতিক্রম করে, সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন কিন্তু তাকে উদারতা বলা যায় না। যে কুফর ও শিরকের ঘোর আঁধার থেকে পৃথিবীবাসীকে মুক্ত করতে দীনে ইসলামের আগমন, সেই ইসলামের অনুসারীরা যদি বুঝে, না বুঝে উদারতার নামে কুফর-শিরককে সাধুবাদ জানায় তখন হায় আফসোস ছাড়া আর কী করার থাকে। বিষয়টি খুবই নাযুক ও গুরুত্বপূর্ণ। তাই বক্ষমান নিবন্ধে অমুসলিমদের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শনের ইসলামী পদ্ধতির কিছুটা বিবরণ দেয়া হবে।

সালাম ও সম্ভাষণ প্রসঙ্গ

মানুষ পারস্পরিক সাক্ষাতে শুভেচ্ছা বিনিময় করবে এটা স্বভাবজাত বিষয়। ইসলাম এই শুভেচ্ছাকে আরো উন্নত করে দু'আর রূপ দিয়েছে। তাই এক মুসলমান অপর মুসলমানের সাক্ষাতে 'আসসালামু আলাইকুম'–তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক বলে শুভেচ্ছা জানায়; তার জন্য দু'আ করে।

কুরআনে মাজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার নিকট মনোনীত ধর্ম ইসলাম। (সূরা আলে ইমরান- ১৯)

তাই প্রকৃত শান্তি ও রহমত পাওয়ার একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি সে, যে এক খোদাকে বিশ্বাস করে, ইসলামের অনুসরণ করে এবং আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত রাসূলের আনুগত্য করে। বিধায় কোন অমুসলিমকে 'আসসালামু আলাইকুম' বলে শুভেচ্ছা জানানো জায়েয হবে না। কারণ যিনি শান্তি দিবেন তাকেই সে বিশ্বাস করে না। এজন্য কুরআন শরীফে অমুসলিমদেরকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের যে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার মাধ্যমেই তাদেরকে শুভেচ্ছা জানানো হবে– 'আসসালামু আলা মানিত্তাবা'আল হুদা' –শান্তি বর্ষিত হোক তার উপর যে প্রকৃত হিদায়াতের অনুসরণ করে। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৪০২)

উক্ত আলোচনা থেকে এও বোঝা গেল , কোন অমুসলিম যদি মুসলমানকে সালাম দেয় তাহলে তার জবাবে ওয়ালাইকুমুস সালাম বলে জবাব দেয়া যাবে না। বরং ওয়াআলাইকুম বলে ক্ষান্ত হবে। মুসাফাহার ব্যাপারটিও এমনই। কারণ মুসাফাহা সালামের পরিপূরক। এর দ্বারা মুমিনের গুনাহ মাফ হয়। আর যখন কোন অমুসলিমকে সালাম-মুসাফাহা করা নিষিদ্ধ হয় তখন তাদেরকে তাদের শিরকী বিশ্বাসমূলক শব্দ যেমন 'নমস্কার' বলার বৈধতার প্রশ্নই আসে না। কারণ মুসলমানের জন্য আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কারো সামনে নত হওয়ার অনুমতি নেই।

উৎসব উপলক্ষে অমুসলিমকে শুভেচ্ছা জানানো

অমুসলিমদেরকে তাদের উৎসব কেন্দ্রিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে অনেক সময় সীমালঙ্ঘন হয়ে যায়। সুতরাং এক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন অপরিহার্য। যদি অমুসলিমদের উৎসবটি বিবাহ ইত্যাদি জাতীয় হয় যা ইসলামেও অনুমোদিত তাহলে শুভেচ্ছা জানানো দোষণীয় নয়। কিন্তু তাদের উৎসব যদি শিরকজাতীয় কিংবা ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়, যেমনঃ পূজা, দিওয়ালী, বড়দিন– তাহলে এ উপলক্ষে তাদেরকে শুভেচ্ছা জানানো, দিওয়ালীর হোলি খেলতে যাওয়া, মেরী ক্রিসমাস বলা কোনভাবেই বৈধ হবে না। এর দ্বারা শুভেচ্ছাদাতার ঈমান হুমকির মুখে পড়ে যায়। অন্তত সেই শুভেচ্ছাদাতা এর সমর্থক হিসেবে গণ্য হয়। তাই এ সকল ক্ষেত্রে প্রকৃত শুভেচ্ছা হবে, তাদের হিদায়াতের জন্য দু'আ করা। ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে বর্তমানে অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে একশ্রেণীর মুসলমানকে মাতামাতি করতে দেখা যায়। সংযুক্ত আরব আমিরাতের এক লেখক অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে বলছেন, অমুসলিমদের প্রতি উদারতা দেখাতে গিয়ে খ্রিস্টানদের বড়দিনে আরব-অনারব মুসলমানরা খোদ খ্রিস্টানদের চেয়েও বেশি আনন্দিত হয় এবং ক্রিসমাসের কেনাকাটা করে। খোদাদ্রোহী এই কর্মকাণ্ডে আমাদের বাংলাদেশও পিছিয়ে নেই। এখন তো রাষ্ট্রের কর্ণধারদের তরফ থেকেই 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার' প্রচারণা চালিয়ে মুসলিমদেরকে অমুলিমদের উৎসবে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। মুসলমানরাও এখন সবাইকে শারদীয় শুভেচ্ছা জানায়। তাহলে কি ধর্ম শুধু নামেই রয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা আমাদের বুঝার তাওফীক দান করেন। আমীন।

অমুসলিমদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ

পাঠক! যখন অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসবের শুভেচ্ছা জানানোই নাজায়েয ও হারাম তখন তাদের এ সকল শিরকী, বানোয়াট ও ইসলাম বিরোধী উৎসবে মুসলমানদের অংশগ্রহণের বৈধতার তো প্রশ্নই আসে না। রইল তাদের বিয়ে-শাদীতে মুসলমানদের অংশগ্রহণ। এতে তাদের অনুষ্ঠানে যে পরিমাণ নাচ-গান, মদপান ইত্যাদির ছড়াছড়ি হয় তাতে মুসলমানের বিয়েতেও এমন হলেই তো সে অনুষ্ঠান শরয়ী দৃষ্টিতে বর্জনীয়।

পাঠক সহজে অনুমান করতে পারছেন যে, নিঃসন্দেহে এটাও বর্জনীয় হবে।

অমুসলিমদের দেয়া খাবার খাওয়া উপহার গ্রহণ করা

দীনে ইসলাম উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িয়েছে। আর এই সামাজিকতা ও উত্তম চরিত্রের অন্যতম অধ্যায় হল হাদিয়া দেয়া-নেয়া বা খাবার খাওয়ানো। কোন অমুসলিমকে খাওয়াতে ইসলামে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। বরং এতে তার ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। তাই এটাও দাওয়াতের উদ্দেশ্যে হলে তার সওয়াবও অনেক বেশি হবে। একই কথা হাদিয়ার ক্ষেত্রেও হবে।

খাইবার বিজয়ের সময় যয়নব বিনতে হারেস কর্তৃক হাদিয়া কৃত ভুনা বকরী নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গ্রহণ করেছিলেন।যাতে সে বিষ মিশিয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে নবীজীকে তা জানিয়েছিলেন। যার বিবরণ সহীহ বুখারী; ২৬১৭নং বর্ণনায় রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন অমুসলিম রাজা-বাদশাহদের উপঢৌকন নবীজী গ্রহণ করেছেন। হযরত মারিয়া কিবতিয়া রাযি. নবীজীর দাসী যাকে মিশরের বাদশাহ মুক্বাউকিস উপহার স্বরূপ দিয়েছিলেন। (আলমুগনী ১৩/২০০)

আর অমুসলিমকে খাওয়ানো বা হাদিয়া দেয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা আমরা সহীহ মুসলিমের ২০৩৬ নং হাদীস থেকে পাই। নবীজী বলেন, মুমিন এক উদরে আহার করে আর কাফের সাত উদরে খায়। এ হাদীসের প্রেক্ষাপট ছিল, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাড়িতে একজন অমুসলিম মেহমান হয়ে এসেছিলেন। রাসূলুল্লাহর নির্দেশে তার জন্য একবেলায় সাতটি বকরীর দুধ দোহন করা হয়েছিল; আর এই সাত বকরীর দুধ সে একাই পান করে নিয়েছিল। একই ব্যক্তি পরদিন যখন ইসলাম গ্রহণ করল, তখন এক বকরীর দুধ পান করেই সে পরিতৃপ্ত হয়েছিল।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো অমুসলিমের হাদিয়া গ্রহণ করেছেন। হাদিয়া প্রদানকারী ইসলাম বিদ্বেষী হলে রাসূল তা গ্রহণ করেননি। আর যখন হাদিয়া প্রদানকারীর মুসলমানদের প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষা কিংবা তার ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বুঝেছেন তার হাদিয়া গ্রহণ করেছেন।

অসুস্থ অমুসলিমের সেবা

কোন মুসলমান অসুস্থ হলে তার সেবা শুশ্রুষার তো বিশাল ফযীলত রয়েছে। কিন্তু প্রিয় নবীজীর সুন্নাত ছিল কোন অমুসলিম অসুস্থ হলে তিনি তারও খোঁজ -খবর নিতে যেতেন। এতে তাঁর উদ্দেশ্য হতো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেয়া।

হযরত বুরাইদা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা নবীজীর পাশে বসা ছিলাম। তিনি বললেন, চলো, আমরা আমাদের ইহুদী প্রতিবেশীর (ইয়াদত) খোঁজ-খবর নিয়ে আসি। নবীজী গেলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে অমুক! তুমি কেমন আছো? অতঃপর তাকে কালিমায়ে শাহাদাত পড়তে বললেন। সে কিছুক্ষণ ইতস্তত করল, কিন্তু পরিশেষে সে কালিমা পড়ে মৃত্যুবরণ করল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনন্দিত হয়ে রাব্বুল আলামীনের প্রশংসা করলেন। (আমালুল ইয়াউমি ওয়াললাইলা; পৃষ্ঠা ৫৫৪)

বোঝা গেল, অমুসলিম অসুস্থ হলে তার খোঁজ-খবর নেয়া কেবল সামাজিকতাই নয় বরং রাসূলের অন্যতম একটি সুন্নাতও বটে।

প্রিয় পাঠক! সৌজন্য প্রদর্শনের আরেকটি ক্ষেত্র হল, অমুসলিমরা মৃত্যুবরণ করলে তাদের নিকটজনদের বেদনায় শরীক হওয়া। তাদের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া। তাদের জন্য উত্তম বদলার (হিদায়াতের) দু'আ করা। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অমুসলিমদের হিদায়াত চেয়ে দু'আ করেছেন– হে আল্লাহ! আপনি আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করে দিন; তারা বোঝে না।

মনে রাখতে হবে, তাদের জন্য মাগফিরাত তথা গুনাহ মাফের দু'আ করা নাজায়েয ও হারাম। আল্লাহ তা'আলা মুশরিককে বিনা তাওবায় কখনো মাফ করবেন না। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৪০২)

প্রিয় পাঠক! পৃথিবীতে ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যা তার অনুসারীদেরকে বিধর্মীদের প্রতিও সদ্ভাব প্রদর্শন ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছে। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.

অর্থ : যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে ঘর-বাড়ি হতে বহিষ্কার করেনি তাদের সঙ্গে সদাচরণ করতে ও তাদের প্রতি ইনসাফ করতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ইনসাফকারীদেরকে পছন্দ করেন। (সূরা মুমতাহিনা- ৮)

আর হাদীস শরীফে উত্তম চরিত্রকে সদাচরণ ও নেক কাজ বলা হয়েছে। ইমাম কারাফী রহ. উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, (সদাচরণ হল,) ১. অমুসলিমদের সঙ্গে দয়া ও মমতামিশ্রিত স্বরে কথা বলা; দম্ভ ভরে কিংবা অপমানসূচক ভঙ্গিতে নয়। ২. প্রতিবেশী হলে তার প্রদত্ত কষ্ট অনুগ্রহপূর্বক সহ্য করা। ৩. তার হিদায়াত ও সৌভাগ্যের জন্য দু'আ করা । ৪. তাদের কল্যাণকামী হওয়া। ৫. তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের গৃহ-পরিবার থেকে অনিষ্ট দূর করা।

মোটকথা, একজন নিম্নশ্রেণীর লোকের সঙ্গে একজন উচ্চশ্রেণীর লোকের সদাচরণের যত পদ্ধতি ও উপায় রয়েছে তার সবই অমুসলিমদের সঙ্গে সদাচরণের অন্তর্ভুক্ত। আর এর সবই আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের হুকুম পালনার্থে করা। (আলফুরূক ৩/২১-২২)

কোন মুসলমানের পিতা-মাতা মুশরিক হলে তাদের সঙ্গে সদাচরণের ব্যাপারে কুরআন মাজীদে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। (অর্থ:) আর আমি নির্দেশ দিয়েছি সন্তানকে পিতা-মাতার সঙ্গে সদাচরণের। হ্যাঁ, যদি তারা তোমাকে শিরক করতে বাধ্য করে তাহলে তোমরা তাদের অনুসরণ করো না। বরং তাদেরকে উত্তম ও যথোপযুক্ত সঙ্গ দাও। (সূরা লুকমান- ১৫)

হযরত উম্মে হাবীবা রাযি.-এর মুশরিক মাতা তার কাছে বেড়াতে এসেছিলেন। তিনি রাসূলের দিকনির্দেশনা চাইলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার মাতার খিদমত ও সদাচরণেরই নির্দেশ দিয়েছিলেন।

নিকটাত্মীয় বা প্রতিবেশী অমুসলিম হলেও ইসলাম তার সঙ্গে সদ্ব্যবহারেরই নির্দেশ দেয়। ইসলামে মুসলিম ও অমুসলিম প্রতিবেশীর মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। একজন মুসলিম প্রতিবেশীর যতগুলো অধিকার রয়েছে অমুসলিম প্রতিবেশীরও কমবেশি সে পরিমাণই অধিকার রয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনার সারনির্যাস হল-

১. অমুসলিমদেরকে বৈধ সম্ভাষণ জানানো ও তাদের সাথে বিনম্র ব্যবহার করা চাই।

২. ইসলামী আকীদা বিধ্বংসী ও শরীয়ত পরিপন্থী অনুষ্ঠানসমূহ বর্জন করতে হবে।

৩. দাওয়াতের উদ্দেশ্যে তাদের সঙ্গে উপহার ও দাওয়াত আদান-প্রদান বৈধ আছে।

৪. তাদের বিপদাপদে ও দুঃখে শরীক থাকা সওয়াবের কাজ।

৫. তাদের জন্য হিদায়াতের দু'আ করা সুন্নাত।

৬. অসুস্থ হলে তাদের খোঁজ খবর নেয়াও সুন্নাত।

প্রিয় পাঠক! ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য যে, ইসলামে মুসলিম ও অমুসলিম প্রতিবেশীর মাঝে কোন পার্থক্য করা হয়নি। তাই একজন মুসলিম প্রতিবেশীর যতগুলো অধিকার রয়েছে অমুসলিম প্রতিবেশীর জন্য তার অধিকাংশই কার্যকর হবে। এ পর্যায়ে একটা ঘটনা না লিখে পারছি না।

নওমুসলিম মাহফূযুর রহমান ভাইয়ের মুখে শোনা। ঘটনাটি যাত্রাবাড়ীর কোন এক মহল্লার। এক মুসলিম পরিবার ও এক হিন্দু পরিবার পাশাপাশি বসবাস করত। অধঃপতিত এই সমাজের সাধারণ রীতি– প্রতিবেশীরা কেউ কাউকে চেনে না। এদের অবস্থাও শুরুতে তা-ই ছিল। তবে তারা এতটুকু জানতো যে, উভয়ের প্রতিবেশীই ভিন্ন ধর্মের। একবার হিন্দু প্রতিবেশীর কর্তা তার গর্ভবতী স্ত্রীকে রেখে বিশেষ কোন কাজে ঢাকার বাইরে গিয়েছিলেন। স্ত্রীটির স্বাভাবিক সময়ের পূর্বেই প্রসববেদনা উঠল। এদিকে স্বামীর সঙ্গে তার যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা ছিল না। অসহায় নারীটি অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে। যেহেতু ঘটনাটি কোন ফ্লাটের নয়; সাধারণ বাসার। তাই প্রতিবেশী মুসলিম মহিলাটি জেনে যায় এবং ঘটনাটি নিজ স্বামীকে জানায়। শুনে তার স্বামী সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থ প্রতিবেশীকে হাসপাতালে নেয়ার ব্যবস্থা করে এবং আল্লাহর মেহেরবানীতে মহিলাটি নিরাপদে একটি সন্তান প্রসব করে। কিন্তু কে জানতো, এই নবজাতক তার প্রকৃত প্রতিপালকের পক্ষ হতে তার পিতা-মাতার জন্য ঈমান ও ইসলামের পয়গাম নিয়ে এসেছে।

যা হোক, হাসপাতালের কার্যক্রম শেষ করে মুসলিম প্রতিবেশীটি প্রসূতি মহিলার অজান্তেই তার নবজাতকের জন্য কিছু কেনাকাটা করে বাসায় নিয়ে আসে। যেহেতু ভিন্নধর্মী লোকদের থেকে মানুষ সচরাচর এমন সদয় ব্যবহার কল্পনাও করে না। তাই হিন্দু মহিলার আশ্চর্যের সীমা ছিল না। বাসায় ফিরে ঘর সে ভর্তি বাজার দেখে রীতিমতো হতভম্ব হয়ে যায়। ক'দিন পর যখন ব্যস্ত স্বামীটি বাসায় ফিরে স্ত্রীর কাছে এতসব কাণ্ডের ইতিবৃত্ত জানতে চাইল তখন স্ত্রী বলল, আমাকে কি জিজ্ঞেস কর, পাশের বাড়ির মুসলমান দম্পতির কল্যাণেই না আমরা এ বাবুটার চেহারা দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছি। স্বামীটি মুসলিম প্রতিবেশীর এত আন্তরিকতা প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেনি। পরে সে ঐ মুসলমান লোকটির হাত ধরে বলল, ভাই! আপনি কেমন মুসলমান! আমরা তো এমন মুসলমান কোথাও দেখিনি। মুসলিম প্রতিবেশীটি দাওয়াতের উপযুক্ত সময় বুঝে তার সামনে ইসলামের মাধুর্য তুলে ধরে। ফলে হিন্দু স্বামী-স্ত্রী উভয়েই কালিমায়ে শাহাদাত পড়ে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

প্রিয় পাঠক! ঘটনাটি লেখার উদ্দেশ্য হল, অমুসলিমদের প্রতি শরীয়ত সমর্থিত সৌজন্য প্রদর্শন করলে তারা দীনের সৌন্দর্য বুঝতে পারে। কিন্তু আজ মানুষ উদারতার নামে নিজেদের মনমতো সৌজন্য প্রদর্শন করতে গিয়ে নিজের ঈমান-আমল সর্বস্ব বিলিয়ে দিচ্ছে। পক্ষান্তরে যে আখলাকের মাধ্যমে তাদেরকে ইসলামের দিকে টানা যায় সে আখলাককে নিজের জীবন থেকে বহুদূরে ঠেলে দিয়েছে। তাদের মতে উদারতার অর্থ হল, নিজের দীন-ধর্মের সাথে গাদ্দারী করে বিজাতীয় সংস্কৃতিতে ডুবে যাওয়া। পক্ষান্তরে ইসলামের উত্তম আখলাক দেখিয়ে তাদেরকে পরকালীন মুক্তির দিকে আকৃষ্ট করার অর্থ হল ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা (নাউযুবিল্লাহ)। দয়াময় রাব্বে কারীম আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

লেখক : শিক্ষক, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

(১৯ পৃষ্ঠার পর : গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন)

যে কোন আলেমের জন্য বিচ্ছিন্নভাবে অন্য মাযহাবের সিদ্ধান্ত প্রচারের অনুমতি যেমন নেই, জনসাধারনের জন্য কোন ক্ষেত্রেই এর অনুমতি নেই।

নিম্নে এ মর্মে ইমাম নববী রহ. ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ., নিকট অতীতের প্রসিদ্ধ আরব আলেম শাইখ উছাইমীন রহ. ও সমকালীন বিশ্ববরেণ্য আলেম জাস্টিস মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের উক্তিসমূহ উল্লেখ করা হল-

১. সহীহ মুসলিম শরীফের প্রাচীনতম নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যাকার শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী হাফিযুল হাদীস ইমাম নববী রহ. লিখেন,

وَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَوْ جَازَ اتِّبَاعُ أَيِّ مَذْهَب شاء لا فضى إِلَى أَنْ يَلْتَقِطَ رُخَصَ الْمَذَاهِبِ مُتَّبِعًا هَوَاهُ وَيَتَخَيَّرَ بَيْنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ وَالْوُجُوبَ وَالْجَوَاز وَذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى انْحِلَالِ رِبْقَةِ التَّكْلِيفِ بِخِلَافِ الْعَصْرِ الْأَوَّل فَإِنَّهُ لَمْ تَكُنْ الْمَذَاهِبُ الْوَافِيَةُ بِأَحْكَامِ الْحَوَادِثِ مُهَذَّبَةً وَعُرِفَتْ: فَعَلَى هَذَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي اخْتِيَار مَذْهَب يُقَلِّدُهُ عَلَى التَّعْيِينِ. (المجموع شرح المهذب للنوى ١٢٠/١)

২. হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. লিখেন,

نَظِيرُ هَذَا أَنْيَعْتَقِدَ الرَّجُلُ ثُبُوتَ شُفْعَةِ الْجِوَارِ إذَا كَانَ طَالِبًا لَهَا، وَعَدَمَ ثُبُوتِهَا إذَا كَانَ مُشْتَرِيًا، فَإِنَّ هَذَا لَا يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ. وَكَذَا مَنْ بَنَىعَلَى صِحَّةِ وِلَايَةِ الْفَاسِقِ فِي حَال نِكَاحِهِ وَبَنَى عَلَى فَسَادِ وِلَايَتِهِ فِي حَالِ طَلَاقِهِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ.
وَلَوْ قَالَ الْمُسْتَفْتِي الْمُعَيَّنُ: أَنَا لَمْ أَكُنْ أَعْرِفُ ذَلِكَ. وَأَنَا مِنْ الْيَوْمِ أَلْتَزِمُ ذَلِكَ، لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَفْتَحُ بَابَ التَّلَاعُبِ بِالدِّينِ، وَفَتْحِ الذَّرِيعَةِ. إلَى أَنْ يَكُونَ التَّحْلِيلُ وَالتَّحْرِيمُ بِحَسَبِ الْأَهْوَاءِ. (الفتاوى الكبرى لابن تيمية-٣/٢٠٤ط.مكتبه الشامله)

৩. আরবের শায়েখ উছাইমীন রহ. বলেন,

فالعامى يجب عليه ان يقلد علماء بلده الذين يثق بهم وقد ذكر هذا شيخنا عبد الرحمن بن سعدى رحمه الله وقال: "العامة لا يمكن أن يقلدوا علماء من خارج بلدهم لأن هذا يؤدى إلى الفوضى والنزاع"(لقاء الباب المفتوح: ٣٢/١٩)

৪. শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী দা.বা. লিখেছেন,

خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کے دور میں دیانت عام تھی جس پر اعتماد کیا جا سکتا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے انی نفسانیت اس قدر مغلوب تھی کہ خاص طور سے شریعت کے احکام میں انہیں خواہشات کی پیروی کا خطرہ نہیں تھا اسلئے ان حضرات کے دور میں تقلید مطلق اور تقلید شخصی دونو پر عمل ہورہا یار بعد میں جب یہ زبردست خطرہ سامنے آیا تقلید کو تقلید شخصی میں محصور کر دیا گیا اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ایسانہ کیا جاتا تو احکام شریعت کے معاملہ میں جو... افرا تفری برپا ہوتی اسکا تصور ہم مشکل ہی سے کرسکتے ہیں. (تقلید کی شرعی حیثیت- ص:٧١)

আপনাদের খতীব সাহেবকে উপরোক্ত বক্তব্যগুলোর সহীহ অনুবাদ করে শোনাতে বলবেন। এরপর আপনারাই সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। **(অসমাপ্ত)**

ইসলামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম-৪

মাওলানা আব্দুল মালেক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

লোকমুখে প্রসিদ্ধ দু'টি ঘটনা

হযরত নূহ আ. এর যামানায় প্লাবনকালীন দু'টি ঘটনা লোকসমাজে প্রসিদ্ধ রয়েছে-

১. প্লাবন শুরু হওয়ার আগে নূহ আ. এর তৈরিকৃত কিশতিতে তার কাফের কওম ঠাট্টাবশত মলত্যাগ করল। একদিন এক কুষ্ঠ রোগী তাতে পড়ে গিয়ে ভালো হয়ে গেলে লোকেরা দলে দলে এসে রোগীর সুস্থতার নিমিত্তে মল সংগ্রহ করতে লাগল। এক পর্যায়ে কিশতী ধুয়ে ধুয়ে পানি সংগ্রহ করতে লাগল। ফলে কিশতী পরিস্কার হয়ে গেল...!

২. প্লাবনের পূর্বক্ষণে এক বুড়ি নূহ আ. কে বলল, নূহ! প্লাবনের পূর্বে আমাকে তোমার কিশতীতে নিয়ে যেও। নূহ আ. কিশতীতে আরোহনের সময় বুড়ির কথা ভুলে যান। কিন্তু বুড়ি প্লাবনকালীন প্লাবনের কথা টেরই পায়নি...!!

উপরোক্ত দু'টি ঘটনাই সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এর কোনো সহীহ (নির্ভরযোগ্য) সূত্র নেই। কাজেই এ জাতীয় ঘটনা বলা বা বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম

পবিত্র কুরআনে কারীমে যে সকল নবীকে 'উলুল আযম'র সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে, হযরত ইবরাহীম আ. তাদের অন্যতম। ঐতিহাসিক বর্ণনামতে বর্তমান ইরাকের বাবেল (ব্যাবিলন) শহরে তিনি খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ১৯০০ অব্দে কিলদানিউন নামক মূর্তিপূজক কওমের প্রতি নবী হিসেবে প্রেরিত হন। পিতা আযরও ছিলেন মূর্তিপূজক এবং মূর্তি ব্যবসায়ী। ইবরাহীম আ. অত্যন্ত জোরালো যুক্তি ও প্রজ্ঞাপূর্ণ ভাষায় তাদেরকে আল্লাহর তাওহীদ ও একত্ববাদের দাওয়াত দেন এবং তাদের সামনে তাদের মা'বুদখ্যাত মূর্তিগুলোর অক্ষমতা প্রকাশার্থে তাদের অনুপস্থিতির সুযোগে মন্দিরের ছোট মূর্তিগুলো ভেঙে বড়টির কাঁধে কুঠার ঝুলিয়ে রাখেন। কওমের লোকেরা ঈমান আনার পরিবর্তে ক্রোধান্বিত হয়ে হযরত ইবরাহীম আ.কে বিশাল আগুনের কুণ্ডলীতে নিক্ষেপ করল। কিন্তু ইবরাহীম আ. এর মু'জিযা স্বরূপ মহান আল্লাহর নির্দেশে আগুন তার জন্য শান্তিদায়ক ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এদিকে বাবেলের মূর্তিপূজক বাদশাহ নমরুদ নিজের প্রভুত্ব প্রমাণে হযরত ইবরাহীম আ. এর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়। কিন্তু সেখানেও আল্লাহ তা'আলা তার নবীকেই সম্মানিত করলেন। বিতর্কে পরাজিত হয়েও সে ঈমান আনল না।

ইবরাহীম আ. আপন কওমের ঈমান আনয়নের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে মহান আল্লাহর হুকুমে বিবি সারা'কে নিয়ে ইরাকের বাবেল শহর হতে তৎকালীন শামের অন্তর্গত বর্তমান বাইতুল মুকাদ্দাসের পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিনের উদ্দেশ্যে হিজরত করলেন এবং খলীল শহরে অবস্থান করতে লাগলেন। ফিলিস্তিনে পৌঁছার প্রাক্কালে বর্তমান তুরস্কের অন্তর্গত হার্‌রান এলাকায় নক্ষত্রপূজারী এক জাতিকে তিনি আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত প্রদান করেন। ইবরাহীম আ. এর প্রজ্ঞাপূর্ণ দাওয়াতের কথা পবিত্র কুরআনে সূরা আন'আমে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন।

ফিলিস্তিনে অবস্থানকালে কোন কারণে তিনি সস্ত্রীক মিশর গমন করেন। মিশরের তৎকালীন কাফের বাদশাহ বিবি সারা'র সাথে অশোভন আচরণের ইচ্ছা করলেও মহান আল্লাহর কুদরতে তিনি রক্ষা পান। বাদশাহ লজ্জিত হয়ে বিবি সারাকে হাজেরা নাম্নী এক বিদুষী নারী উপহার স্বরূপ প্রদান করেন। বিবি সারা'র অনুরোধে ইবরাহীম আ. হাজেরাকে বিবাহ করেন এবং তার গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেন হযরত ইসমাঈল আ.। ইসমাঈলকে নিয়েই হযরত ইবরাহীম আ. আল্লাহর নির্দেশে পবিত্র কা'বা পুনঃনির্মাণ করেন। এরপর বার্ধক্যের শেষ পর্যায়ে মহান আল্লাহর কুদরতের বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ বিবি সারা হতে জন্মগ্রহণ করেন হযরত ইসহাক আ.। ইসমাঈল এবং ইসহাক দু'জনকেই আল্লাহ তা'আলা পরবর্তীতে নবুওয়াত দান করেন।

হযরত ইবরাহীম আ. তার অবস্থানস্থল 'খলীল' শহরেই ইন্তিকাল করেন এবং এখানে সমাধিস্থ হন। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ১/১৭৭-২১৫, তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন [সূরা আনআম-৭৬], আতলাসুস্ সীরাতিন নাবাবিয়্যা; পৃষ্ঠা ২৫)

হযরত লূত আলাইহিস সালাম

হযরত লূত আ. ছিলেন হযরত ইবরাহীম আ. এর ভাতিজা। ইবরাহীম আ. এর প্রতি ঈমান এনে তারই সাথে ইরাকের ব্যাবিলন হতে ফিলিস্তিনে হিজরত করেন। ঐতিহাসিক বর্ণনা মতে বর্তমান জর্ডানের অন্তর্গত সাদুম জনপদের (জর্ডান ও ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী) অধিবাসীদের প্রতি খ্রিস্টপূর্ব ১৯০০ অব্দে নবী হিসেবে প্রেরিত হন।

লূত আ. এর কওম পুরুষ সমকামিতার মত জঘন্য ও নির্লজ্জ কাজে অভ্যস্ত ছিল। লূত আ. তাদেরকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের এবং এ জঘন্য কাজ হতে নিবৃত্ত হওয়ার দাওয়াত দিলেন। কিন্তু হতভাগা কওম এ দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করল। পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শাস্তি প্রদানের ইচ্ছা করলেন। ফেরেশতা জিবরাঈল, মীকাঈল এবং ইসরাফীল আ. মানব বেশে আগমন করলেন এবং জিবরাঈল আ. উক্ত জনপদকে আসমান পর্যন্ত উঠিয়ে সম্পূর্ণরূপে উল্টে দিলেন। এর পাশাপাশি পাথরের বৃষ্টিও বর্ষিত হল। সমস্ত কাফের কওম এমনকি লূত আ. এর ঈমান গ্রহণকারী দু-কন্যা ব্যতীত কাফের স্ত্রীও ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ১/২১৬-২২৬, মা'আরিফুল কুরআন [সূরা আ'রাফ-৮০])

জনশ্রুতি আছে, জর্ডান ও ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী ডেড সী বা মৃত সাগরই হল উল্টে যাওয়া সেই সাদুম জনপদ।

হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম

হযরত ইবরাহীম আ. এর বয়স যখন ৮৬ বছর তখন বর্তমান ফিলিস্তিনের খলীল নামক শহরে হযরত ইবরাহীম আ. এর ঔরসে বিবি হাজেরা আ. গর্ভে হযরত ইসমাইল আ. জন্মগ্রহণ করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.এর সূত্রে এক দীর্ঘ বর্ণনায় এসেছে, হযরত ইসমাইল আ. যখন দুগ্ধপোষ্য শিশু, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে তখনই ইবরাহীম আ. তাকে এবং তার মাতা বিবি হাজেরাকে জনমানবহীন মরুভূমি মক্কায় রেখে আসেন। বিবি হাজেরা যখন জানতে পারলেন যে এটা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ তখন তিনিও বিনা বাক্যব্যয়ে ইবরাহীম আ. এর রেখে

যাওয়া এক থলে খেজুর আর এক মশক পানিকে সম্বল করে আল্লাহর রহমতের আশায় থেকে গেলেন। পানি ও খেজুর যখন নিঃশেষ হয়ে গেল, তখন তিনি সাফা-মারওয়া পাহাড়ে উঠে উঠে সাহায্যকারীর অনুসন্ধান করতে লাগলেন। এভাবে মারওয়া পাহাড়ে গিয়ে যখন সাত চক্কর পূর্ণ হয়ে গেল, আল্লাহর হুকুমে তখন হযরত জিবরাইল আ. আগমন করলেন এবং তারই পায়ের আঘাতে (অপর বর্ণনা মতে পাখার আঘাতে) ইসমাইল আ. এর পদস্পর্শিত ভূমি হতে উৎসারিত হল যমযম! পরবর্তীতে জুরহুম গোত্র এখানে বসতি স্থাপন করে এবং ইসমাইল আ. উক্ত গোত্রে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবি হাজেরা এখানেই ইন্তেকাল করেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৩৩৬৪)

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর সূত্রে অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত ইসমাইল আ. সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় কথা বলেন।

কুরবানীর অবিস্মরণীয় ঘটনা

ইসমাইল আ. যখন কৈশোরে উপনীত হলেন, তখন ইবরাহীম আ. স্বপ্নে পুত্র ইসমাইলকে আল্লাহর নামে জবাই করতে আদিষ্ট হলেন। মূলত এটা ছিল আল্লাহপ্রেমের অগ্নিপরীক্ষা! যাতে আশেক ইবরাহীম আ. সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। পুত্র ইসমাইল যখন জানতে পারলেন যে, এটা আল্লাহর আদেশ, তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্মত হলেন। পিতা-পুত্র উভয়ে যখন আল্লাহর হুকুমের সামনে পূর্ণ সমর্পিত হলেন, আর ইবরাহীম আ. পুত্রের গলায় ছুরি চালাতে উদ্যত হলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম আ. কে ডাক দিয়ে বললেন, হে ইবরাহীম! তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছ। নিশ্চয় আমি সৎকর্মশীলদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয় এটা ছিল একটি স্পষ্ট পরীক্ষা এবং আমি এক মহান কুরবানীর বিনিময়ে সে শিশুকে মুক্ত করলাম। (সূরা সাফ্‌ফাত- ১০৪-৪০৭)

প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী 'মহান কুরবানীটি' ছিল সাদা রংয়ের শিংবিশিষ্ট একটি মেষ বা ভেড়া। (কাসাসুল আম্বিয়া; পৃষ্ঠা ১৩)

ঐতিহাসিক বর্ণনা মতে ইসমাঈল আ. জুরহুম এবং মক্কার পার্শ্ববর্তী আমালেকা ও ইয়ামানবাসীর প্রতি খ্রিস্টপূর্ব ১৮৫০ অব্দে নবীরূপে প্রেরিত হন। ঐতিহাসিক বর্ণনা মতে তিনি ১৩৭ বছর বয়সে ইন্তিকালের পর মাতা হাজেরার পাশে সমাহিত হন। (আলবিদায়া ১/২৩৪)

হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাম

হযরত ইবরাহীম আ. এর বয়স যখন একশত বছর এবং সারা আ. এর বয়স নব্বই বছর, এমন মুহূর্তে আল্লাহর কুদরতে হযরত ইবরাহীম আ. এর ঔরসে সারা আ. এর গর্ভে হযরত ইসহাক আ. জন্মগ্রহণ করেন। হযরত ইসমাঈল আ. এর ১৪ বছর পর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক বর্ণনা মতে খ্রিস্টপূর্ব সম্ভাব্য ১৮০০ অব্দে বর্তমান ফিলিস্তিনের খলীল নামক স্থানে সেখানকার কিনআনী সম্প্রদায়ের প্রতি নবীরূপে প্রেরিত হন। ১৮০ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। (কিসাসুল আম্বিয়া; পৃষ্ঠা ১৯৬, আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১/২৩৫)

খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত হযরত ইসহাক আ.-পরবর্তী সকল নবী ইসহাক আ. এর বংশধর। আর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন হযরত ইসমাঈল আ. এর বংশধর। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ১/২০৬)

হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম

হযরত ইয়াকুব আ. ছিলেন হযরত ইসহাক আ. এর সন্তান। খ্রিস্টপূর্ব ১৭৫০ অব্দে শাম তথা ফিলিস্তিনের খলীল নামক স্থানে কিনআন সম্প্রদায়ের প্রতি নবী হিসেবে প্রেরিত হন। বর্তমান তুরস্কের হাররান এলাকায় হিজরত করেন এবং সেখানেই বিবাহ করেন। দুই স্ত্রী থেকে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বারোজন সন্তান দান করেন। তন্মধ্যে এক স্ত্রী হতে হযরত ইউসুফ আ.; যিনি পরবর্তীতে নবুওয়াতের সম্মানে ভূষিত হন এবং তার সহোদর বিনইয়ামীন অন্যতম।

তিনি শেষ বয়সে খলীলে ফিরে আসেন এবং এখানেই ইন্তিকালের পর পিতা ইসহাক আ. ও দাদা ইবরাহীম আ. এর পাশে সমাধিস্থ হন। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ১/২৩৮, মু'জিযুত তারীখিল ইসলামী; পৃষ্ঠা ১৬)

ইয়াকুব আ.-এর অপর নাম ইসরাঈল। এজন্য তার বারো সন্তানের অধঃস্তনদেরকে তার দিকে সম্পৃক্ত করে বনী ইসরাঈল বা ইসরাঈলের বংশধর বলা হয়। আর যেহেতু ঈসা আ. পর্যন্ত সকল নবী এ বংশে আগমন করেছেন এ কারণে তাদেরকে আম্বিয়ায়ে বনী ইসরাঈল (বনী ইসরাঈলের নবী) বলা হয়।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম

হযরত ইউসুফ আ. ছিলেন হযরত ইয়াকুব আ.-এর সন্তান। খ্রিস্টপূর্ব ১৭১৫ অব্দে তিনি ফিলিস্তিনে মিশরবাসীদের প্রতি নবী হিসেবে প্রেরিত হন। শৈশবেই মা মারা যাওয়ায় পিতা ইয়াকুব আ. ইউসুফ আ.-কে তার বৈমাত্রেয় অপর দশ ভাই এবং সহোদর বিনইয়ামীনের তুলনায় বেশি ভালোবাসতেন। বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা হিংসাবশত তাকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল এবং একসঙ্গে খেলতে যাওয়ার নাম করে তাকে নিয়ে একটি গভীর কুয়ায় নিক্ষেপ করল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাকে রক্ষা করলেন। একটি ব্যবসায়ী কাফেলার মাধ্যমে তিনি মিশরে পৌঁছুলেন। মিশরের অর্থমন্ত্রী যার উপাধি ছিল আযীয তাকে ক্রীতদাস হিসেবে কিনে নিলেন। আযীযপত্নী যুলাইখা তার অনন্য সাধারণ পৌরুষদীপ্ত সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে অনৈতিক ইচ্ছা করলেও আল্লাহ তা'আলা কুদরতের মাধ্যমে তাঁর নবীকে পূত-পবিত্র রাখেন। এতদসত্ত্বেও আযীযপত্নির ইচ্ছায় তিনি কারাবরণ করেন। ইতোমধ্যে মিসরের তৎকালীন বাদশাহ এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন। ইউসুফ আ. তার যথার্থ ব্যাখ্যা দিলে বাদশাহ তার এতটাই গুণমুগ্ধ হয়ে যান যে, তাকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে কারাগার থেকে মুক্তিদানপূর্বক অর্থমন্ত্রণালয়ের দায়িত্বভার প্রদান করেন। পরবর্তীতে মিশরের সম্পূর্ণ রাজত্বই তার হাতে অর্পিত হয়।

ঐতিহাসিক বর্ণনামতে উক্ত বাদশাহ হযরত ইউসুফ আ.-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং যুলাইখার স্বামীর ইন্তিকালের পর যুলাইখাকে ইউসুফ আ. এর সঙ্গে বিবাহ দেন।

শাসনক্ষমতা হাতে আসার পর ইউসুফ আ. নিজ পিতা এবং ভাইদেরকে মিসরে নিয়ে আসেন এবং বৈমাত্রেয় ভাইদের অপরাধ ক্ষমা করে দেন। আর এভাবেই ফিলিস্তিন হতে মিশরে বনী ইসরাঈলের আগমন ঘটে। হযরত ইউসুফ আ. মিশরেই ইন্তিকাল করেন। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ১/২৩৯-২৬২, মা'আরিফুল কুরআন [সূরা ইউসুফ])

হযরত ইউসুফ আ. এর এ ঘটনা পবিত্র কুরআনে সূরা ইউসুফে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

হযরত শু'আইব আলাইহিস সালাম

খ্রিস্টপূর্ব ১৫৫০ অব্দে হযরত শু'আইব আ. জর্ডানের দক্ষিণ দিকে মৃত সাগরের নিকটবর্তী জাযিরাতুল আরবের মাদয়ান জনপদবাসীর প্রতি নবী হিসেবে প্রেরিত হন। যাদেরকে আসহাবে আইকা-ও বলা হত। শু'আইব আ. হযরত মূসা আ.-এর

শ্বশুর ছিলেন। মাদয়ানবাসী কুফর-শিরকে লিপ্ত থাকার পাশাপাশি মাপে কম দেয়া ও ডাকাতির মত দুষ্কর্মে লিপ্ত ছিল। শু'আইব আ. তাদেরকে ঈমান ও সৎকর্মের দাওয়াত দিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে ভাষার বাগ্মীতা প্রদান করেছিলেন। এ কারণে তাকে খতীবুল আম্বিয়া বলা হয়। শু'আইব আ.-এর কওম তার দাওয়াত গ্রহণ করল না। ফলে মেঘাচ্ছন্ন দিনের শাস্তি তথা মেঘ হতে অগ্নি বর্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হল। (আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১/২২৪-২৩২, মা'আরিফুল কুরআন [সূরা আ'রাফ- ৮৫])

হযরত আইয়ূব আলাইহিস সালাম

হযরত আইয়ূব আ. ছিলেন বনী ইসরাঈলের নবীগণের মধ্য হতে অন্যতম। খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে শামের হুরান নামক স্থানে আরামিয়্যুন ও উমূরিয়্যুন সম্প্রদায়ের প্রতি নবী হিসেবে প্রেরিত হন। আল্লাহ তা'আলা তার থেকে সুস্থতা, ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা নেন। পবিত্র কুরআনের সূরা আম্বিয়া (৮৩-৮৫) ও সূরা সোয়াদ (৪১-৪৪)-এ পরীক্ষা সম্বন্ধে কেবল এতটুকু বলা হয়েছে, তিনি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন (পতিব্রতা এক স্ত্রী ব্যতীত) সবকিছু থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। হযরত আইয়ূব আ. ধৈর্য ধারণ করেন এবং দু'আ করতে থাকেন। পরিশেষে মহান আল্লাহ পূর্বের তুলনায় দ্বিগুণ প্রতিদানসহ তাকে সুস্থ করে দেন।

এক্ষেত্রে লোকমুখে প্রসিদ্ধ আছে, আইয়ূব আ. এর শরীর পঁচে পোকা ধরে গিয়েছিল এবং গোশত খসে পড়ে যেতো... ইত্যাদি, ইত্যাদি– এ ধরনের ঘটনা কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় প্রমাণিত নয়। উপরন্তু একজন নবীর শানে এমন ঘটনা যুক্তির দৃষ্টিতেও শোভনীয় মনে হয় না। কাজেই এমন ঘটনা বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ১/১৬২, আল-ইসরাঈলিয়াত; পৃষ্ঠা ২৬৭, তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন [সূরা আম্বিয়া- ৮৩], আসলাসু তারীখিল আম্বিয়া; পৃষ্ঠা ৫৩)

হযরত যুল-কিফল

কুরআনে মাজীদে কেবল তার নামই পাওয়া যায়। তার কোন ঘটনা বর্ণিত হয়নি। কারো মতে তিনি নবী ছিলেন। কারো মতে বনী ইসরাঈলের আলইয়াসা' নবীর খলীফা ছিলেন। আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. নবী হওয়ার মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর [সূরা আম্বিয়া- ৮৫], আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১/২৬৭, তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন [সূরা আম্বিয়া- ৮৫])

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম

হযরত মূসা আ. 'উলুল আযম' রাসূলদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সরাসরি কালাম তথা কথোপকথন হওয়ায় তার উপাধি ছিল কালীমুল্লাহ। ফিলিস্তিন হতে মিশরে স্থানান্তরিত বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের প্রতি খ্রিস্টপূর্ব ১৪৫০ অব্দে তিনি নবী হিসেবে প্রেরিত হন। মূসা আ.-এর জন্মগ্রহণের মুহূর্তে মিশরের তৎকালীন কাফের ও খোদাত্বের দাবীদার ফেরআউন যখন মূসা আ.-এর আগমন ঠেকাতে গণকদের কথায় নির্বিচারে শিশু হত্যায় লিপ্ত হল, তখন আল্লাহ তা'আলা তার অসীম কুদরতে মূসা আ.-কে রক্ষা করলেন এবং ফেরআউনের রাজপ্রাসাদেই তার প্রতিপালনের ব্যবস্থা করলেন।

এরপর নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেই ইসরাইল সম্প্রদায় এবং (ফিরআউনের বংশ) কিবতী সম্প্রদায়ের দু'ব্যক্তির ঝগড়া এবং মূসা আ. এর হাতে অপরাধী কিবতী'র নিহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে মূসা আ. ফিরআউনের আক্রোশে পতিত হওয়ার শঙ্কা সৃষ্টি হয়। ফিরআউনের নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য মূসা আ. মিসর ছেড়ে মাদয়ান গমন করেন। সেখানকার এক বুযুর্গ ব্যক্তি হযরত মূসা আ. এর ঘটনা শ্রবণ করে তার কর্মতৎপরতা আর আমানতদারীতে মুগ্ধ হয়ে ৮/১০ বছর বকরী চরানোর শর্তে নিজ কন্যাদ্বয়ের একজনকে তার সাথে বিবাহ দেন। এই বুযুর্গ কে ছিলেন? সে বিষয়টি মতবিরোধপূর্ণ! প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী তিনি ছিলেন মাদয়ানবাসীদের প্রতি প্রেরিত নবী হযরত শুআইব আ.। তবে বিখ্যাত মুফাসসির আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. এবং আল্লামা তবারী রহ. এর মতে এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য কথা হল, পবিত্র কুরআনে করীমে (সূরা কাসাস- ২২-৩৫) এ ঘটনা বর্ণিত হলেও সেখানে তার নাম উল্লেখ হয়নি। হাদিসের যে রেওয়ায়েতগুলোতে নাম উল্লেখ হয়েছে, তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। কাজেই আসলে তিনি কে ছিলেন তা আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। ইমাম তবারী রহ. বলেন,

الصواب ان هذا لا يدرك الا بخبر ولا خبر تجب به الحجة في ذالك.

বিস্তারিত জানতে তাফসীরে ইবনে কাসীর (সূরা কাসাস- ২৮) দ্রষ্টব্য।

সহীহ বুখারীর বর্ণনামতে (হা.নং- ২৬৮৪) মূসা আ. ১০ বছর পূর্ণ করে মিসরে এসে ফিরআউনের অগোচরে নিজ পরিবারের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে (তাফসীরে ইবনে কাসীর [সূরা কাসাস- ২৮]) স্ত্রীসহ মাদয়ান ত্যাগ করেন। পথিমধ্যে তূর পাহাড়ের নিকট এলে আল্লাহ তা'আলা তাকে নবুওয়াত দান করেন এবং ফিরআউনের প্রতি দাওয়াত পৌঁছানোর নির্দেশ প্রদান করে দু'টি মু'জিযা দান করেন। (১) হাতের লাঠি সাপে পরিণত হওয়া। (২) হাত থেকে শুভ্র উজ্জ্বল আলো বের হওয়া। এ সময়ে হযরত মূসা আ. এর দু'আর বরকতে আল্লাহ তা'আলা তার স্পষ্টভাষী সহোদর হারূন আ. কেও নবুয়ত দান করেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর [সূরা কাসাস- ২৮])

ফিরআউন দাওয়াত গ্রহণ করার পরিবর্তে মূসা আ. কে পরাজিত করার হীন উদ্দেশ্যে দেশের যাদুকরদেরকে একত্রিত করল। আল্লাহর কুদরতে মূসা আ. এর হাতের লাঠি থেকে পরিণত সাপ যাদুকরদের দেখানো সকল সাপ খেয়ে ফেলল। এটা দেখে যাদুকররা মূসা আ. এর উপর ঈমান আনয়ন করল। এতদসত্ত্বেও ফিরআউন ঈমান আনা থেকে বিরত থাকল। উপরন্তু ইসরাঈলীদের উপর যুলুম-নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। আল্লাহ তা'আলা সতর্ক করার উদ্দেশ্যে ফিরআউনীদেরকে খরা, বন্যা, পঙ্গপাল ও ঘুনের মাধ্যমে ফসল ধ্বংস, খাদ্যসামগ্রীতে ব্যাঙ ও রক্ত ইত্যাদির আযাবে নিপতিত করলেন। তবুও তারা ঈমান আনয়ন করল না।

ফিরআউনের ঈমান আনয়নের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে তার যুলুম-নির্যাতন থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহর নির্দেশে বনী ইসরাইলকে সাথে নিয়ে মূসা আ. তাদের পূর্ব আবাসভূমি ফিলিস্তিনের উদ্দেশ্যে হিজরত করেন। মিসর থেকে ফিলিস্তিন গমনের জন্য তৎকালীন সময়ে দু'টি রাস্তা ছিল- (১) স্থলভাগের রাস্তা তথা লোহিত সাগর এবং ভূমধ্য সাগরের মধ্যবর্তী স্থলভাগের রাস্তা যা তুলনামূলক বহুল ব্যবহৃত এবং সংক্ষিপ্ত রাস্তা ছিল। (২) জলভাগের রাস্তা, তথা (স্থলভাগের রাস্তা থেকে কিছুটা দক্ষিণ দিকে সরে গিয়ে) লোহিত সাগরের জলভাগ অতিক্রম করে সিনাই উপত্যকার পথে ফিলিস্তিন গমন।

মহান আল্লাহ তা'আলা গভীর সমুদ্রে ফিরআউনকে নিমজ্জিত করণের মাধ্যমে কুদরতের অসীম কারিশমা প্রদর্শণের

নিমিত্তে (কিংবা অন্য আরো কোন হিকমতের কারণে, আল্লাহই সর্বোজ্ঞ) মূসা আ. কে জলভাগের রাস্তা দিয়ে ফিলিস্তিন গমনের নির্দেশ দেন। মু'জিযা স্বরূপ মূসা আ. এর লাঠির আঘাতে সমুদ্রের উপরিভাগের পানি সরে গিয়ে রাস্তাগুলোর দু'পাশে তা দেয়াল সদৃশ স্থির দাঁড়িয়ে যায় এবং তলদেশের ভূমিতে সৃষ্ট হয় শুষ্ক বারোটি রাস্তা । মূসা আ. তা দিয়ে পার হয়ে যান। ফিরআউন হযরত মূসা আ. এর পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে উক্ত রাস্তা অতিক্রমকালে আল্লাহ তা'আলা পানিকে মিশে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করলে ফিরআউন সদলবলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

উল্লেখ্য, আলোচ্য জলভাগটির ব্যাপারে প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, তা 'নীলনদ' ছিল। এ প্রসিদ্ধিটি ভুল! সঠিক বর্ণনামতে তা ছিল (সিনাই উপত্যকার পশ্চিমে মিশর ভূখণ্ডের কোল ঘেষে প্রবাহিত) লোহিত সাগরের উত্তর দিকের একটি অংশ, যা বর্তমানে 'সুয়েজ উপসাগর' নামে পরিচিত।

কেননা, কুরআনে কারীমের বর্ণনামতে মূসা আ. উক্ত জলভাগ পার হয়ে সিনাই উপত্যকায় পৌছেছিলেন। আর মিসর থেকে সিনাই যাওয়ার পথে যে জলভাগ রয়েছে তা লোহিত সাগর; নীলনদের প্রশ্ন এখানে অবান্তর। মূলত লোহিত সাগরের পূর্বে আরব ভূখণ্ড আর পশ্চিমে মিসর (-এর মূল ভূখণ্ড) অবস্থিত এবং উত্তরে (মিসরের) সিনাই উপত্যকা অঞ্চল অবস্থিত। সিনাই উপত্যকার দু'পাশ দিয়ে লোহিত সাগরের দু'টি শাখা প্রবাহিত হয়েছে। একটি পূর্ব দিক দিয়ে আরব ভূখণ্ডের পাশ দিয়ে। দ্বিতীয়টি পশ্চিম দিক দিয়ে মিসরের মূল ভূখণ্ডের পাশ দিয়ে। এই পশ্চিমের শাখাটিই আমাদের আলোচ্য জলভাগ, যা মূসা আ. পার হয়ে সিনাই উপত্যকায় পৌঁছেছিলেন এবং ফিরআউন তাতে নিমজ্জিত হয়েছিল। পশ্চিমের এ শাখাটির জলসীমার উত্তর তীরের অনতিদূরে ভূমধ্য সাগরের জলসীমা শুরু হয়েছিল। আর এ দুই জলসীমার মধ্যবর্তী স্থলভাগ দিয়েই ছিল ফিলিস্তিনগামী স্থলভাগের রাস্তাটি। বর্তমানে এ স্থলভাগে 'সুয়েজ খাল' খননের মাধ্যমে লোহিত সাগর ও ভূমধ্য সাগরের মাঝে জলসংযোগ স্থাপিত হয়েছে এবং (দক্ষিণ দিক থেকে) এ খালের সংলগ্ন হওয়ার কারণেই লোহিত সাগরের আলোচ্য অংশটুকুকে 'সুয়েজ উপসাগর' নামে নামকরণ করা হয়েছে। (কাসাসুল কুরআন [হিফযুর রহমান সিওহারবী]; পৃষ্ঠা ৩৫৭)

সিনাই উপত্যকায় অবস্থানকালীন সময়ে আল্লাহ তা'আলা তুর পাহাড়ে হযরত মূসা আ. এর উপর তাওরাত কিতাব নাযিল করেন এবং এ পাহাড়েই মূসা আ. আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করতে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন, কিন্তু ... কুরআনের ভাষায়– '...অতঃপর যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন, তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলল এবং মূসা আ. সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেল। যখন তার সংজ্ঞা ফিরে আসল, তখন তিনি বললেন, আপনার সত্তা পবিত্র। আমি আপনার দরবাবে তওবা করছি এবং (দুনিয়ায় কেউ আপনাকে দেখতে সক্ষম নয়- এ বিষয়ের প্রতি) আমি সবার আগে ঈমান আনছি।' (সূরা আরাফ- ১৪৩)

এরপর শক্তিশালী আমালেকা গোত্রের অধিকারে থাকা ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার নিমিত্তে জিহাদের নির্দেশ এলে বনী ইসরাঈল তা মানল না। শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সিনাই মরুভূমির তীহ প্রান্তরে আটকে দেন। শত চেষ্টায় তারা এ ময়দান থেকে বেরুতে পারত না। হযরত মূসা আ. ও হারূন আ. এ প্রান্তরেই ইন্তিকাল করেন। পরবর্তীতে হযরত ইউশা আ. এর নেতৃত্বে পুনরায় ফিলিস্তিনের একাংশ বনী ইসরাঈলের দখলে চলে আসে। (আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১/২৮০, মু'জিযুত তারীখিল ইসলামী; পৃষ্ঠা ২৫, তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন [সূরা বাকারা- ২৪৬])

সহীহ বুখারীর (হা.নং ১৩৩৯) এক বর্ণনায় হযরত মূসা আ. এর মৃত্যু সম্পর্কে এসেছে, হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, হযরত মূসা আ.এর মৃত্যুর সময় হয়ে গেলে আজরাইল আ. যখন তার জান কবজ করতে এলেন, তখন মূসা আ.তাকে একটি চড় মারলেন। আজরাইল আ. ফিরে গিয়ে আল্লাহর কাছে অভিযোগ করলে আল্লাহ তা'আলা বললেন, মূসা একটি বলদ গরুর পিঠে হাত রাখুক, তার হাতের নিচে যতগুলো পশম থাকবে প্রত্যেকটির বিপরীতে তাকে এক বছরের হায়াত দেয়া হবে। মূসা আ. একথা শুনে বললেন, হে আমার রব! এ হায়াত শেষ হয়ে গেলে কী হবে? আল্লাহ তা'আলা বললেন, মৃত্যু। মূসা আ. বললেন, তাহলে এক্ষুনি (আমার জান কবয করা হোক)। মুসনাদে আহমাদের এক বর্ণনায় (হা.নং ৭৬৪৬) মূসা আ. এর থাপ্পড়ের কারণে আজরাইল আ. এর চোখ অন্ধ হয়ে যাওয়া এবং আল্লাহর ইচ্ছায় তা পুনরায় ঠিক হয়ে যাওয়ার বিষয়টিও বর্ণিত হয়েছে।

মূসা আ. সম্পর্কে বেশ কিছু ভিত্তিহীন ঘটনা প্রসিদ্ধ রয়েছে। যেমন- পেটে ব্যথার দরুণ তিনি একবার আল্লাহর নির্দেশে একটি নির্দিষ্ট গাছের পাতা খেলেন। পরের বার আবার পেটে ব্যথা হলে এবার আল্লাহর কাছে জিজ্ঞেস করা ছাড়াই ঐ গাছের পাতা খেলেন কিন্তু এবার সুস্থ হলেন না। আল্লাহ তা'আলা বললেন, গাছের পাতার কোন ক্ষমতা নেই।...' এটি একটি ভিত্তিহীন ঘটনা। নির্ভরযোগ্য কোনো বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত নয়। উপরন্তু এ ঘটনা দ্বারা মূসা আ. এর ঈমানের ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি হয়ে যায় যে, গাছের পাতার যে নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই এটা মূসা আ. এর মত একজন উলুল আযম রাসূলের জানা ছিল না! নাউযুবিল্লাহ।

কাজেই এ ধরণের ঘটনা বলা এবং বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

কারূন প্রসঙ্গ

কারূন হযরত মূসা আ. এর চাচাতো ভাই ছিল। মূসা আ. এর উপর অবতীর্ণ কিতাব তাওরাতের সুন্দর তিলাওয়াত করতে পারার কারণে তাকে মুনাওয়ার (আলোকিত) বলা হত। কোন কোন ঐতিহাসিক বর্ণনায় পাওয়া যায়, সে তাওরাতের হাফেয ছিল। কিন্তু সম্পদের প্রাচুর্য তার মাঝে ঔদ্ধত্য সৃষ্টি করে দিয়েছিল। পবিত্র কুরআনে কারীমে (সূরা কাসাস- ৭৬-৮২) আল্লাহ তা'আলা কারূনের সম্পদের প্রাচুর্যের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে, 'আর আমি তাকে এমন ধনভাণ্ডার দিয়েছিলাম, যার চাবিগুলো বহন করা একদল শক্তিমান লোকের পক্ষেও কষ্টকর ছিল...।' (সূরা কাসাস- ৭৬)

অহঙ্কারবশত সে তার কাপড় এক বিঘাত পরিমাণ বেশী ঝুলিয়ে পরত। এমনকি এক পর্যায়ে সে মুনাফিক হয়ে গেল। মূসা আ. এবং তার কওম কারূনকে আল্লাহ তা'আলা সম্পদে যে হক রেখেছেন তা আদায় করতে এবং অহংকার ত্যাগ করতে নসীহত করেন। কিন্তু সে নসীহত গ্রহণের পরিবর্তে কওমকে হেয় প্রতিপন্ন জ্ঞান করতে লাগল। অবশেষে তার ঔদ্ধত্য যখন চরমে পৌঁছল, তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা আ. এর বদদু'আর দ্বারা

কারূনকে তার সম্পদসহ যমীনে ধ্বসিয়ে দেন!
মূসা আ. কেন বদদু'আ করেছিলেন? এ সম্পর্কে দু'টি কারণ পাওয়া যায়-
১. সম্পদের প্রাচুর্যের দম্ভে সে হযরত মূসা আ. কে বলেছিল, হে মূসা! তুমি যদি নবুওয়াত প্রাপ্তির কারণে আমার থেকে শ্রেষ্ঠ হয়ে থাক, তবে জেনে রাখ যে, আমিও তোমার থেকে সম্পদের প্রাচুর্যে শ্রেষ্ঠ! যদি তুমি চাও তবে আমরা একে অন্যের বিপরীতে বদদু'আ করব...!' এরপর কারূন মূসা আ. এর ব্যাপারে বদদু'আ করে। কিন্তু তা কবুল হল না। এরপর মূসা আ. বদদু'আ করলেন, নবীর বদদু'আ কবুল হয়ে গেল!
২. হযরত মূসা আ. কে অপমাণিত করার নিমিত্তে কারূন এক বদকার নারীকে মূসা আ. এর নামে অপবাদ রটানোর জন্য ঠিক করে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এ মিথ্যা উম্মোচন করে দেন। মূসা আ. রাগান্বিত হয়ে কারুণের বিরুদ্ধে বদদু'আ করেন।
কারূণের এ ঘটনা বনী ইসরাইলের মিসর ত্যাগের পূর্বে হয়েছিল, না পরে? এ ব্যাপারে উভয় মতই রয়েছে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর [সূরা কাসাস- ৭৬], তাফসীরে রূহুল মা'আনী [সূরা কাসাস- ৭৬], আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১/৩৫৮)

হযরত ইউশা আ. ও শামউইল আ.

হযরত ইউশা আ. ছিলেন প্রথমত হযরত মূসা আ. এর খাদেম। পবিত্র কুরআনে কারীমে (সূরা কাহাফ- ৬০) হযরত খযীর আ. এর সাথে হযরত মূসা আ.এর সাক্ষাতের যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, উক্ত ঘটনায় মূসা আ. এর সঙ্গী যুবক ছিলেন হযরত ইউশা আ.। (তাফসীরে ইবনে কাসীর [সূরা কাহাফ- ৬০])
তীহ প্রান্তরে হযরত মূসা ও হারূন আ. এর মৃত্যু হয়ে গেলে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউশা আ. কে নবী হিসেবে বনী ইসরাইলের প্রতি প্রেরণ করেন। ইউশা আ. এর নেতৃত্বে বনী ইসরাইল তাদের পূর্ব আবাসভূমি ফিলিস্তিনের বাইতুল মুকাদ্দাসসহ একটি বড় অংশ জয় করে। ইউশা আ. বনী ইসরাইলের বিবাদ মিমাংসার জন্য বিচারক নিযুক্ত করে দিতেন। তাদের কোন বাদশাহ বা শাসনকর্তা ছিল না। এ অবস্থায় প্রায় তিনশ বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। এ সময় গোত্রপতি এবং কাযীগণই তাদের নিয়ন্ত্রণ করত। তাই এ সময়কে 'কাযীদের যুগ' বলা হত।
শাসক না থাকায় আশপাশের বিভিন্ন সম্প্রদায় হতে তাদের উপর হামলা হতে থাকে। এক পর্যায়ে ফিলিস্তিনের এক পৌত্তলিক সম্প্রদায় আক্রমণ চালিয়ে তাদের বরকতপূর্ণ সিন্দুক যাতে মূসা ও হারূন আ. এর বিভিন্ন স্মৃতি, তাওরাতের কপি ও আসমানী খাদ্য মান্ন এর নমুনা সংরক্ষিত ছিল, তা লুট করে নিয়ে যায়। এ অবস্থায় শামউইল নামক এক ব্যক্তিকে নবুওয়াত দান করা হয়। হযরত শামউইল আ. জ্ঞান ও শারীরিক শক্তি-সক্ষমতায় অনন্য তালূত নামক এক ব্যক্তিকে ইসরাইলীদের বাদশাহ নিযুক্ত করেন এবং তার বাদশাহীর নিদর্শন স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের মাধ্যমে বরকতময় সিন্দুককে বনী ইসরাইলের নিকট ফিরিয়ে দেন। তালূত জর্ডান নদী পার হয়ে ৩১০ জনের কিছু বেশি যোদ্ধা নিয়ে আমালিকার উপর হামলা করেন। বনী ইসরাইলের পক্ষ হতে হযরত দাউদ আ. আমালিকা সম্প্রদায়ের সবচেয়ে সাহসী বীর জালূতকে হত্যা করেন। এভাবে সমগ্র ফিলিস্তিন পুনরায় বনী ইসরাইলের দখলে আসে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৩৯৫৭, তাফসীরে ইবনে কাসীর [সূরা বাকারা- ২৪৬-২৫১], আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১/৩৬৮, ২/৭-১০, তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন [সূরা বাকারা- ২৪৬-২৫১])

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

লেখক : বিভাগীয় প্রধান, উলূমুল হাদীস বিভাগ, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

(২১ পৃষ্ঠার পর : গহরপুরী রহ.)

হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. বলেন, রাহমানিয়ার জমির উত্তর অংশ প্রথমে ওয়াকফ হয়। সেখানে পাঁচতলা ভবন দাঁড়িয়ে যায়। দক্ষিণ অংশের জমিটা ছিল অন্য একজনের। তাকে বিক্রি করতে বা অদল বদল করতে অনেক অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি কোনভাবেই সম্মত হচ্ছিলেন না। এরই মধ্যে একদিন গহরপুরী রহ. রাহমানিয়ায় তাশরীফ আনলেন। আমি বিষয়টি হুযূরকে অবহিত করলে তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠলেন, আপনার পেরেশান হওয়ার কোন দরকার নেই। এটা আপনাদের জন্য ফয়সালা হয়ে আছে। কিছুদিনের মধ্যেই ঐ ব্যক্তি জমি অদল বদল করতে সম্মত হলেন।
তাছাড়া জামি'আ রাহমানিয়ার ভবন সংক্রান্ত যে মামলা মোকদ্দমা চলছে এ ব্যাপারে তিনি বলতেন, আপনারা হকের উপরে আছেন। তিনি আইনী প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করতেন এবং বলতেন, আমি দেখতে পাচ্ছি যে, মামলার রায় আপনাদের পক্ষে আসবে। বাস্তবে হয়েছেও তাই।

বাইয়াত ও খিলাফত

গোটা বাংলাদেশের বিশেষত বৃহত্তর সিলেট ও মোমেনশাহী অঞ্চলের হাজার হাজার উলামায়ে কেরাম এবং ধর্মপ্রাণ মুসলমান হুযূরের হাতে বাইয়াত ছিলেন। দেশবরেণ্য বহু উলামায়ে কেরাম হুযূরের খিলাফত পেয়েছেন। যাদের অন্যতম হলেন, মাওলানা গিয়াসুদ্দীন রহ., পীর সাহেব বালিয়া, মাওলানা ইমদাদুল হক, বালিয়ার বর্তমান শাইখ, মাওলানা হুসাইন আহমাদ উমরপুরী রহ., মাওলানা নূরুল ইসলাম বিশ্বনাথী, মাওলানা মুখলিসুর রহমান কিয়ামপুরী, মাওলানা শফীকুর রহমান সরইঘাটী প্রমুখ।

অন্তিম শয্যায় শেষ নির্দেশনা

হুযূর ছিলেন জামি'আ রাহমানিয়ার শাইখুল হাদীস। বছরে অন্তত দুই তিনবার এখানে আসতেন। সবক উদ্বোধন এবং খতমে বুখারীতেও আসতেন। এভাবে হুযূরের যাতায়াত অব্যাহত ছিল। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে অসুস্থ হয়ে তিনি পিজি হাসাপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।
হাজী মুহাম্মাদ আলী সাহেব বলেন, মুফতী সাহেব হুযূর, মুহতামিম সাহেব হুযূরসহ আমরা কয়েকজন হুযূরকে দেখতে যাই। বিদায় নেয়ার আগে আমি গহরপুরী রহ. কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি তো রাহমানিয়ার শাইখুল হাদীস ছিলেন। সবক উদ্বোধন করতেন, খতমে বুখারী করতেন। আপনার অবর্তমানে এ সকল দায়িত্ব কে আঞ্জাম দিবে? আপনি কাকে আপনার স্থানে রেখে যাচ্ছেন? তখন গহরপুরী হুযূর রহ. মুফতী মনসূরুল হক সাহেবের দিকে ইশারা করেন যে, উনিই আমার পরে অন্যদেরকে নিয়ে এসব খিদমত আঞ্জাম দিবেন।

নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে জান্নাতের পথে

হাসপাতালে থাকা তিনি পছন্দ করতেন না। একদিন বললেন, এখানে থাকলে আমি ভালো হবো না; আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো। সূরা ফাতিহা পড়ে পানিতে ফু দিয়ে পান করব, আল্লাহ ভালো করে দিবেন। রিলিজ হয়ে বাড়িতে গিয়ে ঠিকই সুস্থ হয়ে ওঠেন। কিছুদিন পর স্বাভাবিকভাবে ইন্তিকাল করেন। দিনটি ছিল ২৬ এপ্রিল ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮১ বছর।
তিনি এক পুত্র ও চার কন্যা রেখে যান। পুত্র মাওলানা মুসলেহুদ্দীন রাজু হুযূরের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে বর্তমানে গহরপুর মাদরাসার মুহতামিমের যিম্মাদারী পালন করছেন।
একবিংশ শতাব্দির শুরুর দিকে উপমহাদেশের এই ক্ষণজন্মা মনীষীর অন্তর্ধানে গোটা জাতি একজন প্রকৃত সাধক ও দরদী এক অভিভাবককে হারাল। তার শূন্যস্থান সহজে পূরণ হওয়ার নয়। আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতের সুউচ্চ মাকাম দান করুন। আমাদেরকে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করার তাওফীক নসীব করুন। আমীন।

লেখক : শিক্ষক, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা।

মক্কা-মদীনার স্মৃতি

আরাফার 'সাবীল'

মাথার ওপর সবুজের সমারোহ। পরিচিত নিম আর অচেনা বৃক্ষপত্রের থিরিথিরি কাঁপন। উঁচু উঁচু থাম থেকে হলুদাভ আলো ছড়াচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞান। দূরে মিটিমিটি হাসছে পুরনো চাঁদ। আকাশে চাঁদ-মেঘের চিরন্তন লুকোচুরি। স্বপ্নের আরাফা; রাতের আরাফা। দিনের আলোয় দেখি আরাফার অন্য রূপ। যতদূর দৃষ্টি যায় সবুজ আর সবুজ। না দেখলে মরুভূমিতে এমন ঘন, বিস্তীর্ণ আর অপরিমেয় সবুজ– বিশ্বাস হতে চায় না। পাথর দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে ওঠা চোখ দু'টো বিশ্রাম পেল। সবুজের কোমল করস্পর্শে জুড়ালো মন, মৃদুমন্দ বাতাসে শরীর। এশার ওয়াক্ত হয় হয় এমন সময় আরাফায় পৌঁছলাম। গাছের তলায় অগ্নি-নিরোধক অস্থায়ী তাঁবু। তিনদিকে মোলায়েম নকশী চাদর। নীচে পুরু কার্পেট। চিড়া-গুড়, আর বিস্কুট সহযোগে শেষ হল রাতের আহারপর্ব। মেঘগুলো ক্রমশ ভারি হয়ে উঠছে। বৃষ্টি হবে কি? ভালোই হয়, জাবালে রহমতের পাদদেশে রহমতের অঝোর ধারায় জীবনের সব কালি-ধূলি ধুয়ে মুছে যাক!

নামাযান্তে বিশ্রামের আয়োজন করা হল। পিতৃসম মুরুব্বীদের পাশে স্বস্তি হচ্ছিল না। ঘণ্টাখানেক ঝিম মেরে পড়ে রইলাম। তারপর উঠে গিয়ে তাঁবুর যেখানটায় নিমগাছের গোড়া, শামিয়ানা নেই, সটান শুয়ে পড়লাম। জীবনে এই প্রথম গাছতলায় রাত্রিযাপন! পিঠের নিচে শুকনো পাতার মচমচানি। স্নিগ্ধ বাতাস দুলিয়ে দিল গাছের পাতা। বয়ে নিয়ে গেল গুমোট ভাব। পাতার ফোকর গলে মুখের ওপর চাঁদের আল্পনা। আলো-আঁধারীর পালক-ছোঁয়ায় মনের মুকুরে অজানা পুলক। তনুমন জুড়ে নেমে এসেছে পরম প্রশান্তি। দূরের চাঁদটাকে বড় কাছের মনে হল। অলক্ষ্যেই চাঁদেতে আমাতে জুড়েছি আলাপন। ঘুমের রাজ্যে কখন মেলেছি ডানা জানা নেই।

চোখ খুলল দারুণ কৌতূহল আর বিপুল জিজ্ঞাসা নিয়ে। আমার চারপাশে বিচিত্র ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছে একঝাঁক বোতল। যেন পাহারা বসিয়েছে একদল 'বোতলসেনা'। দীঘল-দেহ, চৌকো-গা, পাতলা-কোমর, ভারি-পেট– অদ্ভুত সব আকৃতি। কম করে হলেও দু'সারিতে পঞ্চাশটি হবেই। ঢাউস সাইজের দু'টোকে কমান্ডার কমান্ডার লাগছে। সেনা হোক আর সেনাধ্যক্ষ ভেতরে সবাই দারুন রসিক। খাঁটি দুধ, আসলি মাঠা আর নানাকিসিমের রসে টইটম্বুর। আম-আপেল-আঙুর, পেয়ারা-কমলা-কলা কেউ বাদ পড়েনি। সবুজ বোতল কিউই-জুসও দেখি 'আহলান সাহলান' জানাচ্ছে। আমার তখন কাকে রাখি কাকে ধরি অবস্থা। অদূরে মুখ টিপে হাসছেন প্রিয় সেকান্দার ভাই। বোঝা গেল, সরস এই আয়োজনটি তার মাথা থেকেই প্রযোজিত হয়েছে। অসম্ভব রকম ভালো মানুষ। হজ্জের সফরেই পরিচয়। তারপর দিলখোলা মহব্বত। শুধালাম, দাদা! আটকা পড়েছি, উদ্ধার করুন। বললেন, আগে এদের আব্দার, তারপর আপনার উদ্ধার। ইয়াল্লা, সবার আব্দার! চোখ কপালে তুলে বলি, গাছতলায় শুয়েছি বলে কি প্রাণীকূলের আত্মীয় ঠাওরেছেন? আদমজাতের ছোট্ট উদরে এতগুলো বোতল গুদামজাত হয় কী করে? বললেন, একসঙ্গে চালান করতে বলিনি; দু'চারটাকে আদর করুন, বাকিগুলো সংরক্ষণ করুন; যা গরম পড়েছে কাজে লাগবে সারাদিন । অবশ্য চাহিবামাত্র আরও দিতে বাধ্য থাকিব। আর ঐ যে দেখুন, সারা রাত ধরে সংগ্রহ করেছি– আরাফার 'সাবীল'। সেকান্দার ভাইয়ের আঙ্গুল লক্ষ্য করে তাকাই। তাঁবুর একপাশে দুই হাত উঁচু আর দশ বাই পাঁচ হাতের বিরাট স্তূপ। আবছা মনে পড়ে, ঘুমের ঘোরে ধুপধাপ শব্দ শোনেছি। ও! এ-ই তাহলে কারবার। বললাম, দাদা! যে-ই রেখে থাকুক, নামটা আপনার কুল্লে সার্থক– সেকান্দারী কায়দায় পুরো বিশটনি ট্রাকটাই তাঁবুতে তুলে এনেছেন। হেসে বললেন, ভাইজান! প্রথমবার এসেছেন তো, সেকান্দারীর দেখেছেন কি! সকালে বড় রাস্তায় বের হোন, দেখবেন আরব সেকান্দাররা আল্লাহর মেহমানদের জন্য কেমন সেকান্দারী দস্তরখান সাজিয়ে রেখেছে। আঁতকে ওঠার ভান করে বললাম, আর দেখার সাধ নেই, নামের সেকান্দার হয়েই যা দেখাচ্ছেন, কামের সেকান্দাররা কী কী দেখাতে পারে আলবত বুঝতে পেরেছি।

প্রিয় পাঠক! দু'আ করি, আল্লাহ তোমাকে একবার হলেও হাজীর বেশে আরাফায় হাজিরা দেয়ার তাওফীক দিন। নিজের চোখেই দেখবে, পথের দু'পাশে চব্বিশ চাকার দশাসই একেকটা ট্রাক; তিনদিকের ডালা খুলে দাঁড়িয়ে আছে। কোনোটা ফলমূলে ভর্তি, কোনোটা জুস-মাঠায় একাকার, আবার কোনোটা আস্ত এক মীনাবাজার। আর একদল সেকান্দার সাহেব 'হাজ্জী! সাবীল সাবীল' বলে তোমাকে আদুরে আহ্বান জানাচ্ছে। তাদের আহ্বানকে সম্মান জানিয়ে এগিয়ে যাও। নির্দ্বিধায় মাথায় তুলে নাও গোটা ফলের পেটি– একটা, দু'টো, তিনটে– কেউ কিচ্ছু বলবে না; নির্ভাবনায় দু'হাতে ঝুলিয়ে নাও ডজন দুয়েক মাঠার বোতল, কেউ কপাল কুঁচকাবে না; আর হ্যাঁ, পিঠের থলেতে ঠেসে ভরে নাও কেক-বিস্কুট আর খেজুর-পনির। তবে খেয়াল রেখো ভায়া! তোমার তাঁবুটি কিন্তু কম করে হলেও সিকিমাইল দূরে। এদিকে সূর্যের জ্বর উঠেছে ৫১ ডিগ্রি। ওদিকে সন্ধ্যা নামলেই ওকূফে মুযদালিফা। পরদিন রমিয়ে জামারাত এবং ফরয তাওয়াফসহ ভারী ভারী অ-নে-ক কাজ। এতসব ভার নির্বিঘ্নে বহন করা নির্ভর করে তোমার বদনখানি এবং পা দু'খানা বহাল তবিয়তে থাকার ওপর। সাবীলের ভারে কোমর ভেঙে কুপোকাৎ হলে কিন্তু মহাসর্বনাশ। ভালো কথা, সাবীল কথাটির মানেই তো বলা হয়নি। সাবীল হচ্ছে, ফী সাবীলিল্লাহ-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। মানে আল্লাহর রাহে দানকৃত বস্তু। উদ্দেশ্য, নেকির আশায় হাজীদের সেবায় বিনামূল্যের উপহার সামগ্রী। কী বললে, তোমার ভাগেরটা? ওটা তো আরাফায় রেখে এসেছি। তুমি নিজেই গিয়ে আনবে বলে। যেয়ো কিন্তু...।

আবু সফওয়া

ভেঙ্গে গেল জীবনের খেলাঘর

খসে পড়ল আরো একটি নক্ষত্র...

মাসউদুল হাসান

আমি তখন ক্লাস ওয়ানে পড়ি। নতুন নতুন বাংলা শিখছি। দু-এক লাইন করে পড়তে চেষ্টা করি সামনে যা পাই। সে সময় আমাদের বাসায় নিয়মিত ‘মাসিক মদীনা’ রাখা হতো। পত্রিকা এলেই আমাদের দু’ভাই-বোনের কাজ ছিল পত্রিকার চতুর্থ কভারে ছাপা সাদা-কালো রঙের টাটা ট্রাকের ছবিটা ভালো করে দেখা। প্রতি মাসে একই ছবি ছাপা হতো। কিন্তু তারপরও সেটাই ছিল আমাদের কাছে দেখার মত একটা বিষয়। এটাই ছিল মাসিক মদীনার সাথে আমার পরিচয়ের সূচনাকাল। এরপর যখন চারপাশের পরিবেশ চোখ মেলে দেখতে শুরু করেছি ততদিনে আমাদের সাথে মাসিক মদীনাসহ বিভিন্ন রকমের ইসলামী পত্রিকার পরিচয় ঘটেছে। আর আজকের দিনে তো আলকাউসার, রাবেতা আমাদের নিত্যদিনের পাথেয়। কিন্তু একথা চির সত্য যে, মাসিক মদীনাই আমাদের ক্ষেত্রে মাইলফলকের কাজ করেছে।

এরপর শরহেবেকায়ার বছর যখন ‘খান’ সাহেব রহ. এর আত্মজীবনী ‘জীবনের খেলাঘরে’ পুরোটা পাঠ করি, তখন কিছুটা অনুধাবন করি যে, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান রহ. কত উঁচু মাপের মানুষ। বইটিতে একদিকে যেমন তার ছোট থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম মুখর জীবনের সকল চিত্র উঠে এসেছে তেমনি তার সমকালীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে অনেক অজানা ইতিহাস আলোচিত হয়েছে গুরুত্বের সাথে।

মূলত বইটি পড়েই আমি তাঁকে জানার ও চেনার সুযোগ পাই। সত্য বলতে কি, বইটি পড়ে এতটাই ভালো লেগেছিল যে, একবার পড়ে তৃপ্ত হতে পারিনি, বারবার পড়েছি। বিশেষত মদীনা পত্রিকা বের করার যে ইতিহাস; বড় করুণ ইতিহাস। এই অংশটুকু অসংখ্যবার পড়েছি এবং এখনো পড়ি। যত পড়ি ততই মুগ্ধ হই তার পাহাড়সম হিম্মতের কথা চিন্তা করে।

‘খান’ সাহেবের সঙ্গে প্রথম ও শেষ সাক্ষাত

তার প্রতি অগাধ ভালোবাসার টানেই কয়েকবার ছুটে গিয়েছিলাম তার বাসায়; গেন্ডারিয়াতে। কিন্তু নিরাপত্তাজনিত কারণে দেখা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হই। সর্বশেষ, ইন্তিকালের দুই মাস আগে আবারো একদিন চেষ্টা করলাম। বাসায় গিয়ে জানতে পারলাম তিনি ধানমন্ডির পপুলার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মাদরাসায় ফেরার পথে শ্রদ্ধেয় বড় ভাই মাওলানা আব্দুর রায্যাক সাহেবকে সাথে করে সেখানে গেলাম একবুক আশা নিয়ে। আলহামদুলিল্লাহ! কল্পনাতীতভাবে সুযোগ পেয়ে গেলাম দেখা করার। খুবই হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় আমাদের সঙ্গে কথা বললেন। কুশল বিনিময় করলেন। সুযোগ বুঝে আমাদের কাছে থাকা তাফসীরে মা‘আরিফুল কুরআনের উপর কৃত তাখরীজ-তাহকীকের পাণ্ডুলিপি[২] পেশ করে দু‘আ চাইলাম। এরপর হযরত উপস্থিত সকলকে নিয়ে হাত তুলে দু‘আ করে দিলেন। এটাই ছিল হযরতের সঙ্গে আমার জীবনের প্রথম ও শেষ সাক্ষাত। এরপর আরো একবার সুযোগ এসেছিল তাকে এক নযর দেখার; তার তিরোধানের পর বাইতুল মুকাররমের উত্তর গেটে। কিন্তু সাহস হয়নি কাছে যাওয়ার...।

চির বিদায়

দীর্ঘ ৮১ বছরের কর্মমুখর সংগ্রামী জীবনের ইতি টেনে নশ্বর এ পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিলেন বাংলা ইসলামী সাহিত্যের ও ইসলামী রাজনীতির প্রাণপুরুষ, মাসিক মদীনার সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান। ভেঙে গেল জীবনের খেলাঘর। খসে পড়ল বাংলার ইসলামী সাহিত্যাকাশের আরো একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র।

তিনি আজ আমাদের মাঝে নেই। তবে তার রেখে যাওয়া অমর কীর্তিগুলো প্রেরণার উৎস হিসেবে যুগযুগ ধরে রয়ে যাবে আমাদের মাঝে।

লেখক : শিক্ষার্থী, উলূমুল হাদীস (৩য় বর্ষ)
জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

[২] জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেটের উলূমুল হাদীস বিভাগের পক্ষ থেকে মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. কৃত তাফসীরে মা‘আরিফুল কুরআনে পরিবেশিত হাদীসসমূহের তাখরীজ-তাহকীকের উদ্যোগ নেয়া হয়। আল্লাহর ফযলে কাজ শেষের পথে। তাওফীকে ইলাহী শামেলে হাল হলে খুব শীঘ্রই পাঠকের হাতে তা তুলে দেয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

(৩৫ পৃষ্ঠার পর : দাওয়াত, হাদিয়া)

তাকে কাপড়-চোপড় হাদিয়া দেয়াকে জরুরী মনে করা হয়। এটাও একটা সামাজিক কুপ্রথা। এর থেকেও বেঁচে থাকা অপরিহার্য। (মাজালিসে আবরার; পৃষ্ঠা ৫২৩-৫২৪)

৩. মুসলমানীর দাওয়াতেও বিবাহের মত উপঢৌকন বা উপহার আদান-প্রদানের ব্যাপক প্রচলন আমাদের দেশে রয়েছে। এর বিধানও বিবাহের উপঢৌকনের মত নাজায়েয এবং পরিত্যাজ্য। (প্রাগুক্ত)

৪. অনুরূপভাবে আকীকার দাওয়াতেও বাচ্চাকে হাদিয়া বা উপঢৌকন পেশ করা হয়। এটাকেও জরুরী মনে করেই করা হয়। এটাও নাজায়েয। (প্রগুক্ত)

৫. গ্রামাঞ্চলে অনেকে মাদরাসার হুযূর বা মসজিদের ইমাম-মুয়াযযিন সাহেবকে বাড়িতে খানার দাওয়াত করে থাকে। খানা শেষে তাকে কিছু টাকা হাদিয়া দেয়াকে জরুরী মনে করা হয়। এমনকি কোন কোন সময় হাদিয়া না দেয়াকে দোষণীয় মনে করা হয়। এটা ঠিক নয়। মনে রাখা দরকার; দাওয়াত খাওয়ানো একটি সুন্নাত আর হাদিয়া দেয়া আরেকটি সুন্নাত। কেউ একটি করল, আরেকটি করল না, তাতে দোষের কি আছে? হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. বলেন, কোন এক সফরে কিছু লোক আমার সাথে দেখা করল এবং একের পর এক সবাই আমাকে নিজ নিজ বাড়িতে নিয়ে হাদিয়া দিতে শুরু করল। আমি তাদেরকে নিষেধ করে বললাম, তোমরা এভাবে হাদিয়া দিতে থাকলে অন্যেরা হয়তো মনে করবে, বাড়িতে নিলেই হাদিয়া দিতে হয়। তাই গরীব লোকেরা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও লজ্জায় আমাকে বাড়িতে দাওয়াত দিতে পারবে না। (আদাবুল মু‘আশারাত; পৃষ্ঠা ৭১)

প্রিয় পাঠক! সংক্ষিপ্ত এই নিবন্ধে দু’টি বিষয় উঠে এসেছে-

১. ইসলামে হাদিয়া-তোহফা ও দাওয়াত প্রদানের গুরুত্ব ও তার পদ্ধতি।

২. দাওয়াত ও হাদিয়ার নামে আমাদের সমাজে প্রচলিত রসম-রেওয়ায ও তার অশুভ পরিণতি।

আসুন, আমরা সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার ও নব উদ্ভাবিত রসম-প্রথা বর্জন করি এবং শরীয়তসম্মত পন্থায় দাওয়াত ও হাদিয়া আদান-প্রদান করে ইহকাল ও পরকালের জীবনকে সুখময় করে তুলতে সচেষ্ট হই।

লেখক : শিক্ষক, জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

তাযকিরাতুল আওলিয়া

মাওলানা আব্দুর রায্যাক যশোরী

লেখক পরিচিতি

জন্ম ও নাম : তাযকিরাতুল আওলিয়া গ্রন্থের রচয়িতা ওলীকুল শিরোমণি শেখ ফরীদুদ্দীন আত্তার রহ.। প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ ইবনে আবূ বকর ইবরাহীম। ডাকনাম ফরীদুদ্দীন। তিনি আতরের ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন বলে আত্তার নামেই বিশ্বময় সুপরিচিত।

মধ্য এশিয়ার নিশাপুর শহরে তার জন্ম এবং এ শহরেই প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী তিনি ৫১৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

ঔষধালয় থেকে ওলীর মাকামে

তিনি প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করার পর এক বড় ঔষধালয়ের মালিক হন। একদিন তিনি দোকানে বেচাকেনায় ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময় এক ভিক্ষুক উচ্চস্বরে বলল, আল্লাহর নামে কিছু দান করুন। কিন্তু আত্তার রহ. নিজ কাজে এতোই মশগুল ছিলেন যে, ভিখারীকে কিছু দেয়া তো দূরের কথা, তার দিকে দৃষ্টি দেয়ারও অবসর পেলেন না। ভিক্ষুক নিরাশ হয়ে বলল, আহা! নগণ্য দুনিয়ার সামান্য ধন দিতে কুণ্ঠিত, না জানি প্রাণ দিতে তুমি কতো কুণ্ঠিত হবে!

ভিক্ষুকের একথা শুনে আত্তার রহ. রেগে গিয়ে বললেন, তুমি যেভাবে দিবে আমিও সেভাবেই দিব। ভিক্ষুক সাথে সাথেই বলল, বেশ তো আমার মতই জান দিবে? একথা বলতে না বলতেই সে ভিক্ষার ঝুলিটি মাথার নিচে রেখে মাটির উপরেই শুয়ে পড়ল এবং মুখে কালিমায়ে তায়্যিবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়তে পড়তে তার প্রাণবায়ূ বের হয়ে গেল।

এ আকস্মিক ঘটনাটি আত্তারের মনে এতোই প্রভাব বিস্তার করল যে, তৎক্ষণাৎ তিনি স্বীয় বিরাট ঔষধালয় ও কারখানা আল্লাহর ওয়াস্তে দান করে তৎকালীন প্রখ্যাত ওলীয়ে কামেল রুকনুদ্দীন আকাকের হাতে নিজেকে সঁপে দিলেন। কয়েক বছর তার সোহবতে থেকে মা'রিফাতের বহু স্তর তিনি পাড়ি দিলেন। তারপর হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা-মদীনায় গমন করে বহু মাশাইখ থেকে অনেক ফয়েয ও বারাকাত হাসিল করেন। সর্বশেষ শেখ মাজদুদ্দীন বাগদাদীর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে মা'রিফাতের উচ্চস্তরে উন্নীত হলে স্বীয় মুরশিদের গৌরবের কারণ হন এবং জগতময় অন্যতম তাত্ত্বিক হিসেবে সুপ্রসিদ্ধি লাভ করেন।

হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী রহ. বহু স্থানে শেখ ফরীদুদ্দীন আত্তার রহ. কে পথপ্রদর্শক ও ইমামরূপে তুলে ধরেছেন এবং তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে বারবার নিজের রচিত বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ মসনবী শরীফে তার প্রতি বিশেষ তা'যীম ও সম্মান প্রদর্শন করেছেন। এমনকি তার বিখ্যাত গ্রন্থে আত্তার রহ. এর একটি কবিতাও সংযোজন করেছেন।

বিশ্ববিখ্যাত পারস্য কবি জামি বলেন, শেখ আত্তারের কবিতায় যেরূপ তাওহীদের মাহাত্ম্য এবং মা'রিফাতের গুপ্ত রহস্য পাওয়া যায় তেমন আর কোন সূফীর কবিতায় দৃষ্টিগোচর হয় না।

রচনাসমূহ

কারো কারো মতে তার রচিত পদ্য ও গদ্যের গ্রন্থ সংখ্যা কুরআনে কারীমের সূরার সমসংখক। অর্থাৎ তার গ্রন্থ সংখ্যা ১১৪ খানা। কাযী নূরুল্লাহ শোহতারী মাজালিসুল মুমিনীন নামক গ্রন্থে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

যাহোক তার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে বর্তমানে তাযকিরাতুল আওলিয়া, মানতিকুত তায়র, মসীবতনামা, আসরারনামা, তাইসীরনামা, ইলাহীনামা, দীওয়ান, পান্দেনামা, অসীয়তনামা, খসরু গোল, শরহুল কলব ইত্যাদি বিখ্যাত। তার সকল গ্রন্থই এতোটাই গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে যে, কেউ কেউ তো ফারসী গ্রন্থ লিখে কাটতির জন্য শেখ আত্তারের নামে জালও করেছে। এ ধরনের জাল গ্রন্থের মধ্যে লন্ডনস্থ ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত লিসানুল হাকীকত অন্যতম।

মৃত্যু

ওলীকুল শিরোমণি মহান এই মনীষী ৬৩৭ হিজরীতে রব্বে কারীমের দরবারে চলে যান। আল্লাহ তা'আলা তার ইলমী মীরাস থেকে গোটা উম্মাহকে বেশি বেশি ফায়দা হাসিল করার তাওফীক দান করুন। আমীন। (কাশফুয যুনূন ১/৩৮৫)

তাযকিরাতুল আওলিয়া

এটি আওলিয়া কেরামের জীবনী সম্বলিত এক অনবদ্য গ্রন্থ। ওলীয়ে কামেল ফরীদুদ্দীন আত্তার রহ. এর এক অমর কীর্তি। তিনি ফারসী ভাষায় ৭০জন ওলীর জীবনী সংক্ষিপ্তাকারে এত চমৎকার ও সাবলীলভাবে তুলে ধরেছেন যা অতুলনীয়। এই ৭০জন আল্লাহ তা'আলার এমন সব মহান ওলী যাদের প্রত্যেকেই হিদায়াতের একেকটি আলোকমিনার।

বৈশিষ্ট্যাবলী

সৃষ্টিগতভাবে মানুষের অন্তরে ১০টি রোগ থাকে। যথা- লোভ, অধিক কথা বলার আগ্রহ, ক্রোধ, হিংসা, কার্পণ্য বা বখীলী, সম্মান কামনা ও প্রভুত্ব প্রিয়তা, দুনিয়ার মহব্বত, খোদপছন্দী, তাকাব্বুর ও রিয়া বা লোক দেখানো। যে ব্যক্তি এই দশটি রোগ হতে আত্মাকে পরিষ্কার করে এবং সাথে সাথে মৌলিক ১০টি উত্তম গুণ অর্জন করে সে প্রকৃত মানুষ হয়ে যায়। আল্লাহর ওলী হয়ে যায়। উত্তম ১০টি গুণ হল, তওবা, তাকওয়া, দুনিয়া বিমুখতা, সবর বা ধৈর্য্য, শোকর, ইখলাস, তাওয়াক্কুল, আল্লাহর মহব্বত, তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্টি ও মৃত্যুচিন্তা।

শাইখ ফরীদুদ্দীন আত্তার রহ. এই গ্রন্থে যে ৭০জন মহামনীষীর জীবনী সংকলন করেছেন তারা সবাই নিজ নিজ আত্মাকে এ সকল রোগ থেকে মুক্ত করে আত্মার উত্তম সব গুণাবলী অর্জন করেছিলেন। ফলে তারা সকলেই হয়েছিলেন নিজ নিজ যুগের হিদায়াতের দিশারী ও উম্মতের কাণ্ডারী।

বিশেষ করে লেখক প্রায় সকল জীবনীতে অতি গুরুত্বের সাথে তাদের দুনিয়া বিমুখতার অধ্যায়টি তুলে ধরেছেন বিশেষভাবে। তাই এটা পরীক্ষিত, এই গ্রন্থ কেউ নিয়মিত পড়তে থাকলে অবচেতন মনেই সে দুনিয়া বিমুখ হয়ে পড়ে। দুনিয়ার মহব্বত তার দিল থেকে দূর হতে থাকে।

এভাবে তাদের জীবনের তাকওয়া-তহারাত ও আল্লাহর মহব্বতের অধ্যায়গুলোও খুব চমৎকারভাবে ও মজবুতীর সাথে পেশ করেছেন। এ বিষয়ে তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া অসংখ্য বাস্তব ঘটনাও উল্লেখ করেছেন, যা নির্জীব হৃদয়কেও সজীব করে তোলে।

প্রতিটি জীবনীতেই আল্লাহ তা'আলার গায়েবী মদদের ঘটনা ও অসংখ্য কারামত উল্লেখ করা হয়েছে,

(৬ পৃষ্ঠায় দেখুন)

দাওয়াত, হাদিয়া ও উপঢৌকন

মাওলানা শফীকুর রহমান টাঙ্গাইলী

হাদিয়া, উপঢৌকন ও দাওয়াত আদান-প্রদান ইসলামী শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল ও প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। মুসলমানদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি ও মিল-মহব্বত অটুট রাখতে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। শত্রুকে বন্ধুতে পরিণত করার মত যাদুকরী শক্তি রয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ আদর্শের মধ্যে। যুগযুগ ধরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ অনুপম আদর্শের অনুসরণ করে মুসলমানরা লাভ করেছে সুখ-সমৃদ্ধ সমাজ ও পরিবেশ। ফলে অমুসলিমরাও এ আদর্শকে অনুকরণ করে জাগতিক উন্নতির পথকে সুগম করছে।

এজন্যই মানচিত্র আর সাদা-কালোর ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে, দল-মত ও গোত্র-বর্ণের বৈষম্য পেছনে ফেলে বিশ্বের সকল দেশের কুটনীতিকরা আজো এই প্রথাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে মজবুতভাবে। হাদীস শরীফে এসেছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা পরস্পর হাদিয়া আদান প্রদান করো, তাহলে তোমাদের পারস্পরিক মিল-মহব্বত, প্রেম-ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। (আলআদাবুল মুফরাদ লিলবুখারী; হা.নং ৫৯৪)

তিনি আরো বলেন, তোমরা পরস্পর হাদিয়া আদান-প্রদান করো, কেননা তা অন্তরের বিদ্বেষ দূর করে। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২১৩০)

দাওয়াত ও হাদিয়া গ্রহণ করার প্রতিও তিনি যথেষ্ট উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেন, তোমরা দাওয়াত কবুল করো, হাদিয়া প্রত্যাখ্যান করো না। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ৪০৭)

আরো বলেছেন, যদি আমাকে একটি খুর (পায়া)-এর দাওয়াতও করা হয় তাহলে তা আমি কবুল করব। একটি খুর হাদিয়া দেয়া হলেও তা আমি সাদরে গ্রহণ করব। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫১৭৮)

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের পাঁচটি হক রয়েছে। (১) সালামের উত্তর দেয়া, (২) অসুস্থ ব্যক্তির সেবা-শুশ্রুষা করা, (৩) জানাযায় শরীক হওয়া, (৪) দাওয়াত কবুল করা, (৫) হাঁচিদাতার 'আলহামদুলিল্লাহ'র জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১২৪০)

প্রিয় পাঠক! উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহে এ বিষয়টি স্পষ্ট হল যে, দাওয়াত, হাদিয়া ও উপঢৌকন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। এর প্রতি তিনি উৎসাহিত করেছেন এবং এর সওয়াব, উপকার ও কল্যাণ প্রভূত ও অগণিত। তবে এ সওয়াব, উপকার ও কল্যাণ তখনই সাধিত হবে যখন তা শরীয়ত সম্মতভাবে সম্পাদন করা হবে, সুন্নাত মোতাবেক হবে। অন্যথায় তা বিদআত ও গুনাহের কাজ বিবেচিত হবে।

দাওয়াত প্রদানের সহীহ তরীকা

১. দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য মহব্বত প্রকাশ। এজন্য যাকে দাওয়াত করা হবে তার আরামের প্রতি খেয়াল রাখা জরুরী। এমন যেন না হয় যে, দাওয়াত খাওয়াটা তার জন্য মুসীবত হয়ে দাঁড়াল। (ইসলাহী খুতুবাত ৫/২৩৯)

২. হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. বলেন, দাওয়াতের ৩টি স্তর রয়েছে।

সর্বোত্তম স্তর : বর্তমান পরিবেশে সবচেয়ে উঁচু স্তরের দাওয়াত হল, যাকে দাওয়াত করা উদ্দেশ্য মেজবান নিজ ইচ্ছানুপাতে তাকে নগদ অর্থই হাদিয়া দেয়া। এতে মেহমানের কোন কষ্ট পোহাতে হবে না। উপরন্তু ঐ টাকা খরচের ব্যাপারে তার পূর্ণ স্বাধীনতাও থাকবে। ইচ্ছা করলে সে খানার মধ্যেও খরচ করতে পারবে কিংবা তার চেয়েও বেশি কোন প্রয়োজনে খরচ করতে পারবে। এতে তার কোনই কষ্ট হল না; বরং আরাম হল এবং উপকারও বেশি হল।

মধ্যম স্তর : যাকে দাওয়াত করার ইচ্ছা হয়, আপ্যায়নের আয়োজন করে তার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া। আপ্যায়ন বা খানা নির্দিষ্ট হয়ে যাওয়ায় এ জাতীয় দাওয়াত মধ্যম স্তরে নেমে এসেছে। তবুও যেহেতু মেহমানের কোথাও যাওয়ার কষ্ট করতে হলো না, সুবিধা মতো খেয়ে নেয়ার সুযোগ পেল তাই এ পন্থাটাও নিন্দনীয় নয়; বরং ভালোই বলা চলে।

নিম্নস্তর : যাকে দাওয়াত খাওয়ানো উদ্দেশ্য তাকে নিজের বাড়িতে ডেকে এনে মেহমানদারী করা। অনেক সময় বন্ধু-বান্ধবদের বাসা ৩০/৪০ মাইল বা ততোধিক দূরে থাকে, সেক্ষেত্রে তাকে দাওয়াত করে আনার অর্থ হল, সে ২/৩ ঘণ্টা আগে বাড়ি থেকে বের হবে। একশত বা দুইশত টাকা ভাড়া খরচ করবে। অতঃপর বাড়িতে এসে খানা খাবে। তাহলে এতে তাকে আরাম পৌঁছানো হল না; বরং কষ্ট দেয়া হল। অথচ এর বিপরীতে যদি তার বাড়িতে খাবার পাঠিয়ে দেয়া হত অথবা নগদ অর্থ দিয়ে দেয়া হত তাহলে সেটাই মেহমানের জন্য স্বাচ্ছন্দের এবং আনন্দের হতো, উপকারীও হতো। (ইসলাহী খুতুবাত ৫/২৩৯)

দাওয়াত কবুল করার বিধান

১. দাওয়াত কবুল করার উদ্দেশ্যও মহব্বত প্রকাশ করা। সুতরাং মহব্বত করে কেউ দাওয়াত করলে তা মহব্বতের সাথেই কবুল করা উচিত। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল, তিনি কারো দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করতেন না। মেজবান অতি সাধারণ কেউ হলেও তিনি তার দাওয়াত কবুল করতেন। এমনকি কোন কোন সময় একজন সাধারণ ক্রীতদাসের দাওয়াতেও কয়েক মাইল সফর করে তার কুটিরে উপস্থিত হয়েছেন। (ইসলাহী খুতুবাত ৫/২৩৮)

অবশ্য দাওয়াত কবুল করা সুন্নাত তখনই হবে যখন তাতে গুনাহের সংমিশ্রণ থাকবে না। যেমন নারী পুরুষের একসাথে খানার ব্যবস্থা করা অথবা খানার আসরে গান-বাজনা ইত্যাদি গুনাহের কাজ চলতে থাকা। কেননা এমন স্থানে দাওয়াতে যাওয়ার অর্থ হল, নিজেকে গুনাহে লিপ্ত করা। (ইসলাহী খুতুবাত ৫/২৪৩)

এ ব্যাপারে মাসআলা হল, যদি পূর্ব থেকেই জানা থাকে যে, দাওয়াতে অংশগ্রহণ করলে কোন কবীরা গুনাহে লিপ্ত হতে হবে তাহলে সেখানে অংশগ্রহণ করা নাজায়েয। আর যদি ধারণা হয় যে, সেখানে কোন গুনাহ হলে সে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে, তাহলে মেহমান যদি সাধারণ মানুষ হয় তার জন্য সেখানে অংশগ্রহণ করার অনুমতি থাকবে। আর যদি তিনি গুরুত্বপূর্ণ ও অনুসরণীয় ব্যক্তি হন

তাহলে তার জন্য সেখানে কোন অবস্থাতেই শরীক হওয়া জায়েয নেই। (ইসলাহী খুতুবাত ৫/২৪৫, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৬/৪২২)

২. কারো সম্পূর্ণ অথবা অধিকাংশ আয়-উপার্জন যদি হারাম থাকে তাহলে জেনে-শুনে এমন ব্যক্তির দাওয়াত কবুল করা জায়েয নেই। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৪২০)

৩. যাকে দাওয়াত করা হয় শুধু সে-ই যাবে। অতিরিক্ত কাউকে সাথে নিবে না (অনুমতি ছাড়া)। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৪৬১)

হাদীসে বিনা-দাওয়াতী মেহমান সম্পর্কে বলা হয়েছে, এ লোক চোর হয়ে প্রবেশ করল, আর ডাকাত হয়ে বের হল। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৩৭৪১)

[এছাড়া মেহমান ও মেযবানের আদব শিরোনামে আদাবুল মু'আশারাত নামক কিতাবে আরো বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। পাঠকদের তা দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।]

১. বরযাত্রীর দাওয়াত : শরীয়তে বরযাত্রীর দাওয়াত বলতে কোন দাওয়াত নেই। এটা মেয়ের বাবার উপর যুলুম করারই নামান্তর। যে লোকটা ১৫/২০ বছর তার মেয়েকে ভরণ-পোষণ দিয়ে মানুষ করে আজ আরেকজনের হাতে উঠিয়ে দিচ্ছে তার অন্তরে তো দুঃখের কোন শেষ নেই। সেক্ষেত্রে যদি তার উপর দাওয়াত খাওয়ানোর বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয় (বিশেষ করে ২০০/৩০০ মানুষ বা আরো বেশি শর্ত করে) তাহলে এটা তার উপর কী পরিমাণ যুলুম হবে! সেটা একমাত্র হৃদয়বানরাই বুঝতে পারে।

২. জন্ম দিনের দাওয়াত, মৃত্যু বার্ষিকী, তিনদিনা ও চল্লিশার দাওয়াত। শরীয়তে এগুলোর কোন ভিত্তি নেই। এগুলো বিদআত ও কুসংস্কার। সুতরাং এগুলো থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য।

৩. মুসলমানীর দাওয়াত : মুসলমানী বা খতনা করার সাত দিনের মাথায় ঢাক-ঢোল পিটিয়ে আত্মীয়-স্বজনসহ অনেক মানুষকে দাওয়াত করার প্রথা বিভিন্ন এলাকায় প্রচলিত আছে। শরীয়তে এরও কোন ভিত্তি নেই।

৪. ওয়ায-মাহফিলে খানার দাওয়াত : বর্তমানে বিভিন্ন এলাকায় ওয়ায-মাহফিল শেষে ব্যাপক আকারে শ্রোতাদের খিচুড়ী, বিরিয়ানী ইত্যাদি খাওয়ানো হয়ে থাকে। এটা ওয়ায-মাহফিলের উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক। কেননা এর পিছনে পড়ার কারণে আয়োজকদের ওয়ায শোনার সৌভাগ্য হয় না। অপরদিকে শ্রোতারাও বয়ানের তুলনায় সেদিকেই গুরুত্ব বেশি দেয়; মনোযোগ সহকারে বয়ান শোনার তাওফীক হয় না। এটা পরিত্যাজ্য। এতে অনেক খারাবী আছে। বিস্তারিত জানার জন্য মাজালিসে আবরার; পৃষ্ঠা ৩৬৮ দ্রষ্টব্য।

৫. গণচাঁদার সম্মিলিত দাওয়াত : বড় কোন ব্যক্তির জন্মদিবস বা মৃত্যু দিবসকে কেন্দ্র করে অথবা অন্য কোন উপলক্ষে বিভিন্ন দোকান বা বিভিন্ন বাড়ি থেকে গণচাঁদা উঠিয়ে খিচুড়ী বা বিরিয়ানী পাক করে ধুমধাম করে খাওয়া এবং অন্যকে দাওয়াত করার প্রথাও আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা জায়েয নেই। কেননা এর দ্বারা গরীব-অসহায় চাঁদা দিতে না পারায় মনে কষ্ট পায়। অপরদিকে অনেকে চাপের মুখে চাঁদা দিয়ে নিত্য প্রয়োজন মিটাতে কষ্টে ভোগে। স্বাভাবিক হলে বুঝতো কোন ক্রমেই নিজ প্রয়োজন রেখে এসব কাজে সন্তুষ্টচিত্তে অর্থ ব্যয় করতো না। হাদীসে আছে,

لا يحل لمسلم ان يأكل مال أخيه الا بطيب نفس منه.

অর্থ : কোন মুসলমানের জন্য তার ভাইয়ের সম্পদ খাওয়া তার মনতুষ্টি ছাড়া জায়েয নেই। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২১০৮২)

বর্তমানে আমাদের মাদরাসাগুলোতে বছরের শেষে বিভিন্ন জামাআতের ছাত্ররা বিশেষ করে দাওরায়ে হাদীসের ছাত্ররা সম্মিলিত চাঁদা উঠিয়ে আসাতিযায়ে কেরামকে যে দাওয়াত করে থাকে সেটাও এর আওতায় পড়ে। আকাবিরে দেওবন্দ এটাকে অপছন্দ করতেন। এজন্য এটা থেকে পরহেয করা উচিত।

হাদিয়া প্রদানের সহীহ তরীকা

১. হাদিয়া একটি ব্যক্তিগত আমল। সুতরাং হাদিয়া দিবে গোপনে। হাদিয়া গ্রহীতার উচিত, হাদিয়ার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কিন্তু বর্তমান অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। হাদিয়াদাতা হাদিয়ার কথা প্রকাশ করার ইচ্ছা করে আর গ্রহীতা গোপন রাখার চেষ্টা করে।

২. হাদিয়া যদি টাকা ছাড়া অন্য কিছু হয়, তবে গ্রহীতার রুচি জেনে নিবে। তারপর তার পছন্দনীয় জিনিসটাই হাদিয়া দিবে।

৩. হাদিয়ার সময় বা হাদিয়া দেয়ার পরে নিজের কোন প্রয়োজনের কথা প্রকাশ করবে না। কেননা এতে হাদিয়া গ্রহীতার মনে স্বার্থ হাসিলের সন্দেহ জাগবে না।

৪. হাদিয়ার পরিমাণ এত বেশি (ভারী) না হওয়া; যা হাদিয়া গ্রহীতার বোঝা মনে হয়।

৫. যাকে হাদিয়া দিবে, তার কাছে হাদিয়ার বিশুদ্ধতা প্রমাণ করা ছাড়া হাদিয়া পেশ করবে না।

৬. হাদিয়া ফেরত দিলে ফেরত দেয়ার কারণ ভালোভাবে জেনে নিবে এবং ভবিষ্যতে সেদিকে খেয়াল রাখবে।

৭. যথাসম্ভব রেল কিংবা ডাকযোগে হাদিয়া পাঠাবে না। কেননা এতে হাদিয়া গ্রহণকারীর নানারকম কষ্ট পোহাতে হয়।

৮. হাদিয়া গ্রহীতার অনুমতি ছাড়া বা তাকে না জানিয়ে তার বাসায় বা তার সীটে কোন কিছু হাদিয়া রেখে দিবে না। এতে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়।

৯. কাউকে সফরের সময় এই পরিমাণ হাদিয়া দিবে না, যা বহন করা তার পক্ষে কষ্টকর হয়। যদি একান্তই দেয়ার ইচ্ছা হয় তাহলে তার বাসায় পৌঁছে দিবে।

১০. হাদিয়া দেয়ার সময় স্পষ্ট বলে দিবে যে, এটা হাদিয়া। অন্যথায় শুধু সামনে রেখে দিলে বিভিন্ন সম্ভাবনা থাকে। যেমন- দীনের জন্য দান, সদকা, আমানত ইত্যাদি। (আদাবুল মু'আশারাত থেকে সংগৃহীত)

হাদিয়া গ্রহণ

১. কেউ কোন কিছু হাদিয়া দিলে বিনিময়ে তাকেও কিছু হাদিয়া দেয়া উচিত। (সহীহ বুখারী; হা.নং ২৫৮৫) আর বিনিময় দেয়া সম্ভব না হলে কমপক্ষে মৌখিক এই বলে দু'আ দিবে جزاك الله خيرا (আল্লাহ তা'আলা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন)। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২০৩৫)

২. হাদিয়া যেহেতু মহব্বতের নিদর্শন। এজন্য কারো কাছ থেকে কোন কিছু হাদিয়া পেলে হাদিয়াদাতার মনোরঞ্জনের জন্য তার সামনে তা ব্যবহার করে দেখানো উত্তম।

৩. কারো কাছ থেকে কোন হাদিয়া পাওয়ার সাথে সাথে হাদিয়াদাতার সামনেই তা দান করা কিংবা চাঁদা হিসেবে অথবা অন্য কাজে খরচ করা অনুচিত। কেননা এতে হাদিয়াদাতা কষ্ট পান। (আদাবুল মু'আশারাত; পৃষ্ঠা ৬৯)

হাদিয়া দেয়ার উত্তম কয়েকটি স্থান

হাদিয়া যেহেতু মুসলমানদের পারস্পরিক মহব্বতের নিদর্শন। সুতরাং মুসলমান বলতে যে কাউকে হাদিয়া দেয়া সুন্নাত বলে বিবেচিত হবে। তবে তার সাথে যদি আরো কারণ যুক্ত হয় তাহলে আরো বেশি সওয়াব হবে। যেমন-

১. আত্মীয়তার সম্পর্ক : আত্মীয়-স্বজনকে হাদিয়া দেয়া হলে হাদিয়ার সওয়াব পাওয়ার পাশাপাশি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করারও সওয়াব পাওয়া যাবে।

২. প্রতিবেশী : প্রতিবেশীকে হাদিয়া দিলে হাদিয়ার সওয়াবের সাথে সাথে প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার ও তার হক আদায়ের সওয়াবও পাওয়া যাবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. এর পরিবারে একটি বকরী জবাই করা হলে তিনি পরিবারের সদস্যদেরকে বলেন,

اهديتم لجارنا اليهودى؟ اهديتم لجارنا اليهودى؟

অর্থ : তোমরা কি আমাদের ইহুদী প্রতিবেশীকে হাদিয়া দিয়েছো? তোমরা কি আমাদের ইহুদী প্রতিবেশীকে হাদিয়া দিয়েছো? আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, জিবরাঈল আমীন আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে এত বেশি তাকীদ করতে থাকেন যে, আমার ধারণা হয়, না জানি তিনি প্রতিবেশীকে আমার ওয়ারিশ বানিয়ে দেন। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১৯৪৩)

৩. উলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দীন : এতে কোন সন্দেহ নেই যে, উলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দীনকে মানুষ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যেই মহব্বত করে। কারণ এতে দুনিয়াবী কোন স্বার্থ নেই। তাই উলামায়ে কেরামকে হাদিয়া দেয়া একমাত্র আল্লাহর জন্যই হবে। আর ইখলাসের সাথে আল্লাহর জন্য কোন কাজ করলে যে সওয়াব বেশি হয় এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। উপরন্তু এতে দীনের খিদমতও নিহিত আছে। এসব বিবেচনা করেই তাবলীগের মুরুব্বীয়ানে কেরামের পক্ষ থেকে সাধারণ মুসলমানদের প্রতি নির্দেশনা হল, যখন উলামায়ে কেরামের সাথে সাক্ষাত করতে যাও তখন তাদের জন্য হাদিয়া নিয়ে যাও। তাই ইমাম, খতীব, মুআযযিন, মাদরাসার শিক্ষকসহ সকল উলামায়ে কেরামের খিদমত করা ও তাদেরকে সাধ্যমতো হাদিয়া দেয়া আমাদের উচিত। এটা আমাদের জন্য ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য অত্যন্ত উপকারী হবে। শাইখ সা'দুদ্দীন রহ. বলেন, আমাদের মাশাইখে কেরাম (তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে) বলতেন, যে ব্যক্তি চায় যে তার ছেলে আলেম হোক; তার জন্য উচিত উলামা-ফুকাহায়ে কেরামের প্রতি খেয়াল রাখা, তাদের সম্মান করা, তাদের দাওয়াত করা ও তাদেরকে হাদিয়া দেয়া। এতে কোন কারণ বশত তার ছেলে যদি আলেম না-ও হতে পারে, তার নাতি (পরবর্তী প্রজন্ম) অবশ্যই আলেম হবে। (তা'লীমুল মুতা'আল্লিম [মাকতাবাতুল হেরা]; পৃষ্ঠা ২০)

মূলত আমাদের অন্তরে দীন এবং ইলমে দীনের গুরুত্ব কমে গেছে। অন্যথায় উলামায়ে কেরামকে (যাদের থেকে আমরা দীন শিখে থাকি) যতই হাদিয়া দেয়া হোক না কেন, সেটা অনেক কম, একেবারেই সামান্য। হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহ. একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন, এক মন্ত্রীর ছেলে সূরা বাকারা শেষ করলে তিনি ছেলের উস্তাদকে আড়াই'শ স্বর্ণমুদ্রা (যা বর্তমানে ৯৩ ভরি স্বর্ণ থেকেও বেশি) হাদিয়া দেন। উস্তাদ হাদিয়া পেয়ে বললেন, এত বেশি হাদিয়া! আমি আর কি খিদমত করেছি? মন্ত্রী উস্তাদকে আলাদা ডেকে বললেন, সামনে থেকে আপনি আমার ছেলেকে আর পড়াবেন না। কারণ আপনার অন্তরে সূরা বাকারার মর্যাদা আড়াই'শ স্বর্ণমুদ্রা থেকে কম। আর আমার হাদিয়ার দাম আপনার নিকট সূরা বাকারা থেকেও বেশি। আপনারই যদি এই অবস্থা হয় তাহলে আমার ছেলের অন্তরে কুরআনে কারীমের কি মর্যাদা সৃষ্টি হবে। (মাজালিসে আবরার; পৃষ্ঠা ১৪)

প্রচলিত হাদিয়ার আরো কিছু রীতি-নীতি

১. চাঁদা উঠিয়ে হাদিয়া দেয়া : হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. বলেন, কোন এক গ্রামবাসীর দাওয়াতে একবার দুপুরবেলা বের হলাম। সেখান থেকে যখন বিদায় নেয়ার সময় হল, তখন গ্রামের লোকেরা আমাকে হাদিয়া দেয়ার জন্য গোটা গ্রাম থেকে কিছু কিছু সংগ্রহ করে জমা করল। আমি জানতে পেরে তাদেরকে কঠোরভাবে নিষেধ করে বললাম, এতে অনেক অপকারিতা রয়েছে-

প্রথমতঃ চাঁদা দানকারী খুশি মনে দিচ্ছে, না চাপে পড়ে দিচ্ছে, সেদিকে আজকাল চাঁদা গ্রহণকারীরা লক্ষ্য করে না।

দ্বিতীয়তঃ যদি একথা মেনেও নেয়া হয় যে, চাঁদাদাতারা সন্তুষ্ট হয়ে চাঁদা দিয়েছে, তবুও তাতে হাদিয়ার উদ্দেশ্য সফল হবে না। কারণ হাদিয়া দেয়া-নেয়ার উদ্দেশ্যই হল পরস্পর মহব্বত বৃদ্ধি। কিন্তু এতে তা অর্জিত হয় না। কারণ কে কি পরিমাণ দিয়েছে তা আদৌ জানা যায় না।

তৃতীয়তঃ অনেক সময় কোন ওযরের কারণে হাদিয়া গ্রহণ করা অসঙ্গত হয়ে পড়ে। আর হাদিয়াদাতা ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় না। এছাড়া সম্মিলিত হাদিয়া যাচাই করা খুবই জটিল। অতএব যদি হাদিয়া দিতে হয় তাহলে নিজ হাতেই দেয়া উত্তম। (আদাবুল মু'আশারাত; পৃষ্ঠা ৭১)

২. বিবাহ অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক বিভিন্ন হাদিয়া :

ক. লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কনের জন্য বিরাট প্যাকেটে করে হাদিয়া পাঠানো হয় এবং এটাকে জরুরী মনে করা হয়। এটা একটা কুপ্রথা। এ থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। (মাজালিসে আবরার; পৃষ্ঠা ৫২৩)

খ. বিবাহ অনুষ্ঠানে কনে বা বরকে প্রদত্ত হাদিয়া বা উপঢৌকন : বিবাহ অনুষ্ঠানে যেসব উপঢৌকন বা হাদিয়া বর বা কনেকে দেয়া হয়, এর অধিকাংশ ক্ষেত্রে দাতার মনোতুষ্টি বা সন্তুষ্টি থাকে না। শুধুমাত্র চক্ষুলজ্জার খাতিরে বা সামাজিক চাপে পড়ে দিয়ে থাকে। অথচ শরীয়তের দৃষ্টিতে অন্যের মাল তার আন্তরিক সন্তুষ্টি ব্যতীত গ্রহণ করা বা খাওয়া জায়েয নেই। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২১০৮২)

উপরন্তু এ ধরনের মাল গ্রহণ করার জন্য টেবিল সাজিয়ে কে কী দিল, কী পরিমাণে দিল? এর জন্য খাতা-কলম নিয়ে বসা জঘন্য অপরাধ এবং আত্মমর্যাদাহীনতার পরিচায়ক। এ থেকে বেঁচে থাকা অত্যন্ত জরুরী। (জায়েয-নাজায়েয ২/৫৮, মাজালিসে আবরার; পৃষ্ঠা ৫২৩)

অবশ্য কেউ যদি কারো ওলীমার দাওয়াতের খরচের ব্যাপারে সাহায্য করে তাহলে সেটা জায়েয হবে। বরং হাদিয়া দেয়া ও আরেক ভাইকে উপকার করার সওয়াব হবে। হযরত যয়নব রাযি. এর সাথে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহপরবর্তী ওলীমার দাওয়াতে হযরত উম্মে সুলাইম রাযি. খেজুর, ঘি ও পনির দ্বারা তৈরি এক ধরনের খানা (হাইসা) হাদিয়া দিয়েছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলো দ্বারা ওলীমা করেছিলেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫১৬৩)

গ. বিবাহের পর বর পক্ষের নতুন কেউ কনের বাড়িতে গেলে অথবা কনে পক্ষের নতুন কেউ বরের বাড়িতে আসলে

(৩১ পৃষ্ঠায় দেখুন)

নারীর সম্মানের ঠিকানা

মাকসূদুর রহমান

সমাজকে নিষ্কলুষ ও সতী সাধ্বী নারী উপহার দেয়া ইসলামের একটি মৌলিক লক্ষ্য। বিবাহের পূর্বে নারী হবে নিষ্কলুষ পবিত্র। বিবাহের পর নারী হবে স্বামী-আসক্ত; পর-পুরুষে নয়। একইভাবে পুরুষ হবে স্ত্রী-আসক্ত; পর-নারীতে নয়। নারীকে এবং পুরুষকে কেন্দ্র করে ইসলামের যত বিধান আরোপিত হয়েছে তা উল্লিখিত লক্ষ্য বাস্তবায়নেরই জন্য। চারিত্রিক পবিত্রতার বিষয়ে ইসলামের অত্যাধিক গুরুত্বারোপের যৌক্তিক কারণও আছে। পৃথিবীতে আল্লাহর প্রধান ও প্রকৃত প্রতিনিধি হল মানুষ। নারী-পুরুষ মিলেই মানুষের সমাজ। পৃথিবীর মূল প্রতিনিধি যদি অপবিত্রতার দোষে দুষ্ট হয়, তাহলে সভ্য পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম জারজে ভরে যাবে। মানুষ নয়, মানুষ নামের হায়ওয়ানের আবাসভূমি হবে এ পৃথিবী।

ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর নিষ্কলুষতা ও সতীত্বের গুরুত্ব এত অধিক যে, এর বিপরীতে অর্থনৈতিক উন্নতিও নগণ্য ও তুচ্ছ বিষয়। চরিত্র বিসর্জন দিয়ে অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটানো ইসলাম সমর্থন করে না। অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য যদি চরিত্রের বিসর্জন দেয়া বৈধ হয় তাহলে পতিতালয়ের নারীরা কী দোষ করল? তারা তো অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যই এসব করছে। লক্ষণীয় ব্যাপার হল, নারী বিষয়ে ইসলামের বিধানকে অবজ্ঞা করে যে সমাজপতিরা ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছে তাদের অফিস আদালত পর্যন্ত পতিতালয়ে পরিণত হয়েছে। তবে দুই পল্লীর মাঝে তথাকথিত সভ্য-অসভ্যের একটা পার্থক্য রেখা টানা আছে। কিন্তু পরিণতির বিচারে দু'য়ের কর্মপদ্ধতিতে কোন পার্থক্য পাওয়া যায় না।

ব্রিটেনের ট্রেডস ইউনিয়ন কংগ্রেস ও নারী অধিকার গ্রুপ এভরিডে সেক্সিজম এক যৌথ প্রতিবেদনে প্রকাশ করেছে, তাদের জরীপে অংশগ্রহণকারী নারীদের প্রতি পাঁচজনের একজন জানিয়েছে, তারা সরাসরি তাদের সুপারভাইজারদের হাতে যৌন নিপীড়নের শিকার। (দৈনিক ইনকিলাব; ২১ আগস্ট ২০১৬)

এ হল কথিত একটি সভ্য(!) দেশের নারী সমাজের চিত্র। অথচ আলোচিত দেশটি নারী অধিকার রক্ষার একটি মডেল দেশ হিসেবে পরিচিত।

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম নারীর সতীত্ব ও অধিকার রক্ষার সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়েছে। নারীকে নিষ্কলুষ পবিত্র মানুষ হয়ে জীবন যাপনের শিক্ষা দিয়েছে। রাস্তার হাজারো মানুষের প্রলোভনের পাত্র হওয়া থেকে রক্ষা করেছে। যার তার অযাচিত চাহিদা পূরণের মাধ্যম হওয়া থেকে নিরাপত্তা দিয়েছে। আমরা এখানে নারী বিষয়ক ইসলামের সেই বিধান নিয়ে আলোকপাত করবো যা তাকে চারিত্রিক কলুষতামুক্ত পবিত্র জীবন গঠনের পথ দেখাবে।

নারীগণ ঘরে অবস্থান করবে

নারীদের নিরাপত্তা দানে ইসলামের প্রথম নির্দেশ হল, তারা যেন ঘরে অবস্থান করে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তোমরা নিজ নিজ ঘরে অবস্থান করো। (সূরা আহযাব- ৩৩)

নামায ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ। এই নামায আদায়ের জন্য মসজিদে গমনের ব্যাপারেও তাদেরকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

خير مساجد النساء قعر بيوتهن.

অর্থ : নারীদের সর্বোত্তম মসজিদ হল ঘরের কোটর। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২৬৫৪২)

উম্মে হুমাইদ আসসাঈদিয়্যা নামক এক নারী রাসূলের কাছে এসে বললেন, আপনার সাথে নামায পড়া আমার খুব পছন্দের। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

قد علمت انك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك.

অর্থ : জানি, আমার পিছনে নামায পড়া তোমার খুব পছন্দের। কিন্তু তোমার ঘরের অভ্যন্তরে নামায পড়া (বাইরের) কক্ষে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম...। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২৭০৯০)

উপরের আয়াত এবং হাদীস অত্যন্ত জোরালোভাবে একথা প্রমাণ করে যে, নারীদের ঘরে অবস্থান করা তাদের নিরাপত্তা বিধানে সবচেয়ে বেশি সহায়ক ও কার্যকর। এ কারণে ফরয, তারাবীহ ইত্যাদি নামাযের জন্যও তাদের মসজিদে গমন করা পছন্দনীয় নয়।

প্রয়োজনে বের হলে পর্দা বিধান পালন করবে

নারীদের ব্যাপারে মূল বিধান হল, তারা ঘরে অবস্থান করবে। তবে ইসলাম যেহেতু মানুষের প্রয়োজন অস্বীকার করে না, তাই যুক্তিসঙ্গত কারণে নারীদেরকে ঘর থেকে বের হওয়ার সুযোগ প্রদান করেছে। পাশাপাশি দু'টি মূলনীতির কথাও বলে দিয়েছে। (এক) বাইরে বের হতে হবে পর্দার সাথে। কুরআনে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট আয়াতটি হল,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

অর্থ : হে নবী! আপনার স্ত্রীদের, আপনার কন্যাদের ও মুমিন নারীদের বলে দিন, তারা যেন তাদের চাদর নিজেদের উপর নামিয়ে দেয়। এ পন্থায় তাদেরকে চেনা সহজতর হবে (যে তারা শরীফ, চরিত্রবতী নারী)। ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না। (সূরা আহযাব-৫৯)

ইবনে আব্বাস রাযি. উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة.

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা মুমিন নারীদের নির্দেশ দিয়েছেন, যখন তারা কোন প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হবে চাদর দ্বারা যেন মাথাসহ মুখমণ্ডল ঢেকে নেয় এবং শুধু একটি চোখ খোলা রাখে। (তাফসীরে ইবনে আবী হাতিম ২/১৪, তাফসীরে ত্ববারী ১৯/১৮১)

ইবনে আব্বাস রাযি.এর উক্ত তাফসীরের ব্যাপারে আরবের প্রসিদ্ধ আলেম মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ উসাইমিন বলেন,

تفسير الصحابى حجة بل قال بعض العلماء : انه فى حكم المرفوع.

অর্থ : সাহাবায়ে কেরামের তাফসীর শরীয়তের দলীল; বরং কতক আলেম বলেছেন, তা বিধান প্রমাণের দিক থেকে মারফূ' হাদীসের হুকুমে।

উপরোক্ত আয়াত ও সাহাবা কর্তৃক তার তাফসীর থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, যদি নারীদের কোন প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হতে হয়, তাহলে পূর্ণ পর্দার সাথে বের হতে হবে। চেহারা, হাত খুলে বের হলে তা শরয়ী পর্দা বলে গণ্য হবে না।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বক্তব্যে সাহাবা যুগের পর্দা পদ্ধতির সচিত্র বর্ণনা এসেছে। তিনি বলেন,

وكانوا قبل ان تنزل اية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها وكان اذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين...

অর্থ : নারী সাহাবিয়াগণ পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে (পর্দার) চাদর ছাড়া বের হতেন। পুরুষগণ তার চেহারা, হাত দেখতে পেতো। তখন নারীর জন্য চেহারা হাত খোলা রাখা বৈধ ছিল। কিন্তু যখন পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হল, নারীগণ পুরুষদের থেকে পর্দা করতে লাগল। (মাজমূউল ফাতাওয়া লিইবনে তাইমিয়া ২২/১১০)

(দুই) নারীরা নিজেদেরকে পর-পুরুষের সামনে প্রদর্শন করতে পারবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন, তোমরা পর-পুরুষের সামনে নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়িও না, যেমন প্রাচীন জাহেলী যুগে প্রদর্শন করা হতো। (সূরা আহযাব- ৩৩)

প্রাচীন জাহেলিয়াত দ্বারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাক-আবির্ভাব কালকে বোঝানো হয়েছে। সেকালে নারীরা নির্লজ্জ সাজ-সজ্জার সাথে নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াতো। ইবনে হাইয়ান বলেন, তারা ওড়না মাথায় ঝুলিয়ে বক্ষ উন্মুক্ত রেখে পর-পুরুষের সামনে সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়াত। (তাফসীরে ইবনে কাসীর ১১/৪৫০)

উপরোক্ত আয়াতে 'প্রাচীন জাহেলিয়াত' শব্দে 'নব্য জাহেলিয়াত' নামের একটা কিছু আগমনের ইঙ্গিত পাওয়া যায় । বর্তমানে অশ্লীলতার দিক থেকে সে রকমের এক জাহেলিয়াত আমরা দেখতেই পাচ্ছি। এ নব্য জাহেলিয়াতের অশ্লীলতা এতটাই উগ্র যে, এর সামনে প্রাচীন জাহেলিয়াত বহুপূর্বে হার মেনেছে। নব্য জাহেলিয়াতের নারীরা ঘরে খুব সাধারণ পোশাক পরলেও বাইরের জন্য থাকে তাদের আবেদন সৃষ্টিকারী পোশাক। তাদের ভ্যানিটি ব্যাগে মেকআপ বক্স থাকা আবশ্যক, যাতে আবেদনময়তার ঘাটতি হলে সাথে সাথে তা পুষিয়ে নেয়া যায়।

কুরআনে কারীমে এ ধরনের জাহেলী চলাফেরা কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। বাইরে বের হলে পর্দাবৃত হয়ে সুগন্ধিমুক্তভাবে বের হতে হবে। যাতে সুগন্ধির আকর্ষণে কেউ তার প্রতি চোখ তুলে না তাকায়। পর্দার বিধান নাযিলের উদ্দেশ্যও তাই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, এটা তোমাদের অন্তর এবং নারীদের অন্তর অধিকতর পবিত্র রাখার পক্ষে সহায়ক হবে। (সূরা আহযাব- ৫৩)

আরবের প্রসিদ্ধ আলেম শাইখ বিন বায রহ. বলেন,

قد اوضح الله تعالى في هذه الاية أن التحجب أطهر لقلوب الرجال والنساء... الخ

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে স্পষ্ট করেছেন, পর্দা পালন নারী ও পুরুষের অন্তরকে অধিক পবিত্র রাখবে। অশ্লীলতা ও তার উপায় উপকরণ থেকে দূরত্ব সৃষ্টি করবে। (মাজমূআতু রাসায়িল ফিলহিজাব; পৃষ্ঠা ৫০)

আপত্তিকর পোশাক পরিহিতাদের জন্য রয়েছে কঠিন ধমকি

আকাশ মিডিয়ার কল্যাণে দূর পাশ্চাত্যের জীবনধারার সাথে এদেশের মানুষের পরিচয় ঘটেছিল। খুব অল্প সময়ে এর বিষক্রিয়া প্রগতিশীল (!) প্রায় প্রত্যেক পরিবারে ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে এদেশের মার্কেটগুলো নারীর পদচারণায় মুখর হয়েছে। পথ-ঘাট, হোটেল, পার্ক সবখানে পুরুষের তুলনায় নারীর সমাগম বৃদ্ধি পেয়েছে। পর্যবেক্ষক মহলের অভিজ্ঞতা হল, বর্তমানে নারীদের মার্কেটে ঘোরাফেরা প্রয়োজনের তাগিদে নয়; নেশার তীব্রতায়। উঠতি বয়সীরা হোটেলে মার্কেটে যায় কোন কিছু কেনাকাটার জন্য নয়; সেলফি তোলা কিংবা বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয়ার জন্য। পোশাকের ক্ষেত্রে আপত্তিকর নগ্ন পোশাক এই শ্রেণীটির প্রথম পছন্দ। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, নির্লজ্জ জীবন পরিক্রমায় কে কতটা অগ্রগামী এই প্রতিযোগিতায় তারা মত্ত। হাদীসে এসেছে,

شر البقاع الاسواق.

অর্থ : নিকৃষ্টতম ভূমি হল বাজার। (সুনানে কুবরা লিলবাইহাকী; হা.নং ১২৩৪০)

অর্থাৎ বাজার-মার্কেট টাইম পাসের কোন জায়গা নয়। শুধু প্রয়োজন পুরা করার ক্ষেত্র মাত্র। পর-পুরুষদের আকৃষ্ট করার জন্য আপত্তিকর পোশাক গ্রহণকারীনীদের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأمثال أسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها.

অর্থ : (অধিক পাতলা বা) নগ্ন পোশাকধারীনী, পর-পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট নারী, যাদের মাথায় রয়েছে উটের কুঁজের মত উত্থিত কেশসমগ্র তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।

স্ত্রী-কন্যাদের সামলে রাখুন

স্ত্রী-কন্যাদের অপকর্মের কারণে পরকালে পরিবার-কর্তাকেও পাকড়াও করা হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বিখ্যাত সাহাবী হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাযি. কে দশটি নসীহত করেছিলেন। তার মধ্যে নবম নসীহত ছিল,

ولا ترفع عنهم عصاك أدبا.

অর্থ : তুমি পরিবারস্থ লোকদের থেকে শিষ্টাচারদণ্ড সরিয়ো না। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২২১২৮)

পরিবার বিপথগামী হলে তাদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা কর্তাব্যক্তির দায়িত্ব। বর্তমানে স্ত্রী-কন্যাদের অন্যায় থেকে বিরত রাখার পরিবর্তে শিথিলতা প্রদর্শন করা হয়। তাদেরকে বেহায়াপনায় জড়ানোর সুযোগ করে দেয়া হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন ব্যক্তির ব্যাপারে বলেন,

ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة ... والديوث الذي يقر في أهله الخبث.

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা তিন ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন।... তৃতীয় হল, দাইয়ূস। অর্থাৎ যে পরিবারে নির্লজ্জতা প্রতিষ্ঠা করে। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ৫৩৭২)

অন্য হাদীসে এভাবে এসেছে,

الذى يسير لاهل السوء.

অর্থ : যে পরিবারের জন্য পাপের পথ সুগম করে। (আলআসমা ওয়াসসিফাত লিলবাইহাকী; পৃষ্ঠা ৭০৩)

নামাযীদের ঘরে পর্দাহীনতা : রাসূলের ভবিষ্যত বাণী

পর্দাহীনতা এখন শুধু দীনহীন পরিবারের চর্চিত বিষয় নয়; বরং দীনদার নামাযীদের ঘরও এ ভাইরাসে আক্রান্ত। পথে-ঘাটে এমন দৃশ্যের মুখোমুখি আমরা প্রায় হই যে, রিক্সায় কিংবা গাড়িতে সুন্নাতী পোশাক পরিহিতের সাথে আপত্তিকর পোশাকে কোন যুবতী বসা। নিজে পাক্কা নামাযী হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রী-কন্যার ভাগ্যে শালীন পোশাকও জুটে না। রাসূলের হাদীসে এমন পরিবেশ হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرجال ينزلون على أبواب المسجد نساؤهم كاسيات عاريات على رءوسهم كأسنمة البخت.

(১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ফাতাওয়া বিভাগ : জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, (আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট) সাতমসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

মাওলানা আব্দুল মজীদ
তুষভাণ্ডার, কালিগঞ্জ, লালমনিরহাট

১৭৪ প্রশ্ন : (ক) আল্লাহ তা'আলা সাকার, নাকি নিরাকার?

(খ) আল্লাহ তা'আলা আরশে সমাসীন, নাকি সর্বত্র বিরাজমান?

উত্তর : (ক) 'আল্লাহ তা'আলা সাকার, নাকি নিরাকার' এটি এমন প্রশ্ন যার জবাব আমাদের জানা আবশ্যক নয়। বরং এ বিষয়ে গবেষণা করাও উচিত নয়। হাদীস শরীফে আছে,

من حسن إسلام المرأ تركه ما لا يعنيه

অর্থ : ইসলামের সৌন্দর্য হলো, অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকা। (মুসনাদে আহমদ; হা.নং ১৭৩৭)

তবে এতটুকু বিশ্বাস রাখবে যে, আল্লাহ তা'আলার নিজের শান অনুযায়ী আকৃতি আছে। যা জান্নাতে গেলে মুমিন বান্দাগণ দেখবেন এবং সেটাই হবে জান্নাতের সর্বোত্তম নিয়ামত। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৭৪৩৬)

(খ) কুরআন পাকের বর্ণনানুযায়ী 'আল্লাহ তা'আলা আরশে সমাসীন' এটা যেমন ঠিক তেমনি তার ইলম ও কুদরত 'সর্বত্র বিরাজমান' এ কথাও ঠিক। কিন্তু তার সত্তা সর্বত্র বিরাজমান এমন কোন প্রমাণ নেই। অপরদিকে আরশে সমাসীন হওয়ার ধরণ ও প্রকৃতি আমাদের বোধ-বুদ্ধির উর্ধ্বে। এজন্য এ বিষয়ে আমাদের গবেষণা করা নিষেধ।

(সূরা শূরা- ১১, তাফসীরে মাযহারী ৩/৩৯৭, ৬/২৪৮, আলমাজমূউস সানিয়্যাহ; পৃষ্ঠা ২৪০, ২৪৬, তাফসীরে রূহুল মা'আনী ৮/৪৭১, সহীহ বুখারী; হা.নং ৭৪৩৬)

মাওলানা মুহাম্মদ ফখরুদ্দীন
ঘিওর, মানিকগঞ্জ

১৭৫ প্রশ্ন : (ক) শরীয়তের দৃষ্টিতে মুসাফির ব্যক্তি ইমাম হয়ে চার রাকাআত নামায পড়ালে ইমাম ও মুকতাদীর নামায সহীহ হবে কি?

(খ) যে ইমাম মুকতাদীদের নফল নামায জামাআতের সাথে পড়তে উৎসাহ দেয় এবং ৩/৪ জন করে জামাআত বানিয়ে নফল নামায পড়ানোর ব্যবস্থা করে, শরীয়তের পরিভাষায় ঐ ইমামকে কী বলা হবে?

উত্তর : (ক) মুসাফির ব্যক্তি ইমাম হয়ে চার রাকাআত পড়িয়ে ফেললে যদি দুই রাকাআতের পর বৈঠক করে থাকে, তাহলে ইমাম ও মুসাফির মুকতাদীর নামায আদায় হয়ে যাবে। বাকি সালাম ফেরাতে দেরী করার কারণে ওয়াক্তের মধ্যে তা দোহরানো ওয়াজিব। আর মুকীম মুকতাদীদের নামায কোনভাবেই সহীহ হবে না। কারণ তারা নিজেদের পরবর্তী দুই রাকাআত ফরয নামাযে নফল নামায আদায়কারীর ইকতিদা করেছে; যা সহীহ নয়।

(ফাতাওয়া শামী ১/৫৭৯, ২/১২৮, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১১/৫৮৪)

(খ) নফল নামায জামাআতের সাথে পড়া মাকরূহ। যদি মুকতাদী তিনজন বা তার চেয়ে কম হয়, তাহলে তা জায়েয। এমনিভাবে সব সময় নফল নামায জামাআতের সাথে পড়াও মাকরূহ ও বিদ'আত। প্রশ্নে বর্ণিত সূরতে নফল নামায জামাআতের সাথে পড়ার প্রতি উৎসাহ প্রদানকারী ও জামাআতের ব্যবস্থাকারী ইমামকে শরীয়তের পরিভাষায় ফাসিক ও বিদ'আতী বলা হবে। কেননা এভাবে ডেকে ডেকে নফল নামাযের জামাআতের ব্যবস্থা করে দেয়া শরীয়তে প্রমাণিত নয়।

(ফাতাওয়া শামী ১/৫৫৩, ২/২৪৯, হাশিয়াতুত ত্বহত্বাবী; পৃষ্ঠা ৩৮৬, মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা ১/৩৩৮, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১১/৩২০)

মুহাম্মাদ মনির
মানিক নগর, ঢাকা

১৭৬ প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের খতীব সাহেবের বয়ানের কিছু কিছু বিষয় বিরোধপূর্ণ মনে হচ্ছে। সঠিক সমাধান জানার জন্য সেই বিষয়গুলো আপনার সমীপে পেশ করছি। এ বিষয়ে মসজিদ কমিটি এবং মুসল্লিদের করণীয় সম্পর্কে শরয়ী সমাধান পেশ করার সবিনয় অনুরোধ করছি। তিনি বলেন,

(ক) যাকাতের টাকা মসজিদে দেয়া জায়েয আছে।

(খ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজে যাওয়ার সময় যে রফরফে করে গিয়েছেন, সেই রফরফ ছিল আব্দুল কাদের জিলানী রহ.। যার প্রমাণ আব্দুল কাদের জিলানী রহ.-এর কাঁধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ের ছাপ বিদ্যমান ছিলো।

(গ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরূদ তো সর্বাস্থায় পড়া যাবে- তথা দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে। কিন্তু নবীর প্রতি সালাম পেশ করতে হলে সাবধানতার সহিত পেশ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি কিভাবে সালাম দিবে 'ওয়াসাল্লিমূ তাসলীমা' (সর্বোত্তম সম্মানের সহিত)। তাহলে সালাম দিতে হবে সর্বোত্তম পন্থায়। এখন আপনারাই বলুন, বসে সালাম দিলে কি সর্বোত্তম পন্থায় সালাম পেশ করা হয়? অবশ্যই না। তাহলে সালাম পেশ করতে হবে দাঁড়িয়ে সর্বোত্তম পন্থায়।

(ঘ) বর্তমান যুগের তাবলীগ জামাআত এটা নবী-রাসূল, ওলী-বুযুর্গদের তাবলীগ নয়। ইসলাম ধর্মে তাবলীগের অর্থ হচ্ছে, বিধর্মীদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দেয়া, বেঈমানের কাছে ঈমানের দাওয়াত দেয়া। এটা হচ্ছে নবী-রাসূল, ওলী-আওলিয়াদের তাবলীগ। তাবলীগের অর্থ যদি হয়, মুসলমানের কাছে দাওয়াত দেয়া। তাহলে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সাহাবায়ে কেরামের সমাধি হতো না।

উত্তর : (ক) মসজিদ যাকাতযোগ্য খাত নয়। সুতরাং কেউ যদি মসজিদে যাকাত দেয় তবে তা নফল দান হয়ে যাবে। তার যাকাত আদায় হবে না। তার যাকাত নির্দিষ্ট খাতে পুনরায় আদায় করা জরুরী। যদি কোন মসজিদ কর্তৃপক্ষ জেনে-শুনে মসজিদের জন্য যাকাত গ্রহণ করে তবে তারা গুনাহগার হবে। দাতাদের যাকাত আদায় না হওয়ার ক্ষেত্রে তারাও দায়ী থাকবে। কারণ যাকাত আদায় হওয়ার জন্য শর্ত হলো, যাকাতের মাল যাকাতের প্রকৃত হকদার ব্যক্তিকে বিনিময়হীনভাবে মালিক বানিয়ে দেয়া। মসজিদে যাকাত দিলে যেহেতু কোন হকদার ব্যক্তিকে মালিক বানানো হয় না। তাই যাকাতও আদায় হবে না।

(ফাতাওয়া হিন্দিয়া ২/৪১৭, ফাতাওয়া শামী ২/৩৪৪, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/২৯২)

(খ) প্রশ্নোল্লিখিত বক্তব্য 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজে যাওয়ার সময় রফরফ নামক যে বাহনে আরোহণ করেছিলেন, সে রফরফ ছিলেন হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহ.' এটা

সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং বানোয়াট। কুরআন-হাদীসে এর কোন প্রমাণ নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত নয় কিংবা রাসূলের সাথে সংঘটিত হওয়ার নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণও নেই, এমন কোন কথা কিংবা ঘটনা রাসূলের দিকে সম্পৃক্ত করে বর্ণনা করা মারাত্মক অপরাধ এবং গুনাহের কাজ। যার পরিণাম জাহান্নাম। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

من كذب علي متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار

অর্থ : যে ব্যক্তি আমার বিষয়ে কোন মিথ্যা রটাবে সে যেন জাহান্নামে আপন স্থান ঠিক করে নেয়। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ৩)

একটু লক্ষ্য করলেও খতীব সাহেবের বক্তব্যের অসারতা প্রমাণিত হয়। যেমন-

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিরাজ হয়েছিলো প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী নবুওয়াতের দশম বর্ষে। আর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহ. এর জন্ম ৪৭১ হিজরীতে। এ দু'য়ের মাঝে ৪৭৪ বছরের ব্যবধান। (দেখুন সিয়ারু আ'লামিন নুবালা খণ্ড ১৫, পৃষ্ঠা ১৮২, দারুল ফিক্‌র মুদ্রিত)

এখন আমাদের প্রশ্ন হলো, মিরাজের সময় হযরত আব্দুল কাদের জিলনী রহ. সশরীরে বিদ্যমান ছিলেন নাকি রূহের জগতে ছিলেন? যদি বলা হয় সশরীরে বিদ্যমান ছিলেন তবে মানতে হবে তিনি দুইবার জন্ম লাভ করেছেন। একবার মিরাজের সময়, আরেকবার ৪৭১ হিজরীতে।

আর যদি বলা হয় তিনি মিরাজের সময় রূহের জগতে ছিলেন। তাহলে তাঁর কাঁধে রাসূলের পায়ের দাগ খতীব সাহেব কিভাবে আবিষ্কার করলেন? আল্লাহই ভালো জানেন। কারণ যখন তার শরীরেরই অস্তিত্ব ছিল না; দাগের প্রশ্ন আসে কোত্থেকে?

২. মিরাজ সংক্রান্ত কোন সহীহ হাদীস এবং সহীহ বর্ণনায় রফরফের কথা বর্ণিত হয়নি। যে সকল বর্ণনায় রফরফের কথা পাওয়া যায় সেগুলোর বর্ণনাসূত্র অত্যন্ত দুর্বল। তা সত্ত্বেও যারা রফরফের অস্তিত্ব স্বীকার করেন তারা এর ব্যাখ্যায় বলেন, রফরফ হলো বিছানা/সবুজ বিছানা /রেশমী বিছানা। আর অন্যমতে, রফরফ হলো সাজানো আসন। (নাসীমুর রিয়ায ২/৩৩৪, সীরাতে মুস্তফা ১/৩০০)

অতএব রফরফের প্রবক্তারাই যেখানে 'বিছানা বা সাজানো আসন' বলে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেখানে আব্দুল কাদের জিলানী রহ. এর কাঁধে আরোহণ করার বিষয়টি খতীব সাহেব কোত্থেকে আমদানী করেছেন?

মোটকথা খতীব সাহেবের বয়ানে এজাতীয় বহু স্ববিরোধী বক্তব্য বিদ্যমান। এমন লোকের জন্য দীনের নামে এসব জালিয়াতি বন্ধ করে অনতিবিলম্বে তওবা করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সহীহ আকীদায় ফিরে আসা জরুরী। অন্যথায় এ অবস্থায় তার ও তার অনুসারীদের ঈমান এবং আখেরাত মারাত্মক শঙ্কার সম্মুখীন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এ ধরণের গোমরাহী ও বদ্‌দীনী থেকে হিফাযত করুন। আমীন।

(সহীহ বুখারী; হা.নং ১২৯১, ২৬৯৭, সহীহ মুসলিম; হা.নং ৩, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ; হা.নং ৩৪০৭১, আলআসমা ওয়াসসিফাত লিলবাইহাকী ২/৩৯১, শরহুস সুন্নাহ লিলবাগাবী ১৫/২০৪, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১৫/১৮২)

(গ) সালাত ও সালামের মাঝে পার্থক্য বুঝাতে গিয়ে খতীব সাহেব আয়াতের অংশ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا এর অর্থ করেছেন 'সর্বোত্তম সম্মানের সহিত সালাম পেশ কর। আর দাঁড়িয়ে সালাম পেশ করলেই সর্বোত্তম পন্থায় সালাম পেশ করা হয়' এটা তার নিজস্ব ও মনগড়া ব্যাখ্যা । কুরআনের গ্রহণযোগ্য কোন অনুবাদক ও মুফাস্‌সিরদের কেউই এ ধরনের অর্থ ও ব্যাখ্যা করেননি।

আর সালামের আসরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে উপস্থিত হন এবং তখন তাঁকে দাঁড়িয়ে সালাম করলে সর্বোত্তম পন্থায় সম্মান প্রদর্শন করা হয়, এমন আকীদা পোষণ করা ভ্রষ্টতা ও গোমরাহী। এতে শিরকের আশঙ্কা আছে।

পক্ষান্তরে হাদীস শরীফে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা একদল ফেরেশতাকে যমীনে নিযুক্ত করে রেখেছেন, যারা যমীনে বিচরণ করতে থাকেন এবং আমার উম্মতের কেউ আমার প্রতি সালাম পেশ করলে তা আমার নিকট পৌঁছে দেন। (সুনানে নাসাঈ; হা.নং ১২৮২, মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ৪৩২০)

রাসূলের প্রতি সালাম পেশ করার সর্বোত্তম পন্থা যদি একমাত্র দাঁড়ানোর মাধ্যমেই আদায় হয় তবে আপনাদের খতীব সাহেব নামাযের তাশাহহুদে السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ বলার সময় কেন সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন করেন না? আর কেনইবা রাসূলের ইমামতিতে নামায পড়ার সময় যখন নাকি সাহাবায়ে কেরামের সামনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সশরীরে বিদ্যমান ছিলেন, সাহাবীগণ দাঁড়িয়ে সালাম পেশ করার সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন করেননি? তাছাড়া যে রাসূল উম্মতের প্রতি এতটাই দয়ার্দ্র ছিলেন যে, ছোট থেকে ছোট বিষয়, চাই তা যত নিম্নস্তরের হোক না কেন, উম্মতকে শিক্ষা দিতে লজ্জাবোধ করেননি, সেখানে তাঁর প্রতি সালাম পেশ করার সর্বোত্তম পন্থা উম্মতকে শিক্ষা দিবেন না এমনটি কল্পনা করাও বেয়াদবী ও ধৃষ্টতা। আর হাদীসের ভাণ্ডারে এমন একটি হাদীসও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা আমার প্রতি সালাত-সালাম পেশ করার সময় দাঁড়িয়ে পেশ করবে। আর আগে থেকে বসা থাকলেও সালাম পেশ করার সময় দাঁড়িয়ে পেশ করবে।' সাহাবা, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন এবং উম্মতের মহান ইমামদের কেউই وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا এর ব্যাখ্যা দাঁড়িয়ে সালাম পেশ করার কথিত 'সর্বোত্তম পন্থা' দেননি। কাজেই এমন আকীদা পোষণ করা গোমরাহী এবং ঈমান বিধ্বংসী। সাথে সাথে পাগলামীও বটে।

(সূরা আহযাব- ৫৬, সুনানে নাসাঈ; হা.নং ১২৮২, সহীহ ইবনে হিব্বান; হা.নং ৯১৪, সুনানে দারেমী; হা.নং ২৯৮১, আলকউলুল বাদী' ফীসসালাতি আলালহাবীবিশ শাফী'; পৃষ্ঠা ৩১২, তাফসীরে জালালাইন; পৃষ্ঠা ৫৫৯, তাফসীরে মুয়াস্‌সার; পৃষ্ঠা ৪২৬, তাফসীরে ইবনে কাসীর ৬/৪৫৭, রূহুল মা'আনী ১১/২৫৫)

(ঘ) এই প্রশ্নের উত্তরের আগে একটি বিষয় আমাদের জানা থাকা প্রয়োজন, কোন শব্দের ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে জরুরী হলো, প্রদত্ত ব্যাখ্যাটি হয়তো শব্দের আভিধানিক অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে কিংবা শব্দটি যদি কোন শাস্ত্র সংক্রান্ত হয় তবে ঐ শাস্ত্রীয় পরিভাষা অনুযায়ী হওয়া আবশ্যক। কোন শব্দ সম্পর্কে কারও ব্যাখ্যা যদি এ দুটোর কোনটার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তবে সে ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় না।

এখন কথা হলো তাবলীগ শব্দের যে ব্যাখ্যা আপনাদের খতীব সাহেব দিয়েছেন যে, 'ইসলাম ধর্মে তাবলীগের অর্থ হচ্ছে, বিধর্মীদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দেয়া, বেঈমানের কাছে ঈমানের দাওয়াত দেয়া। এটা হচ্ছে নবী-রাসূল, ওলী-আওলিয়াদের তাবলীগ।' আরবী ভাষার কোন অভিধানে এমন ব্যাখ্যা নেই। তদ্রূপ কুরআন, হাদীস, ফিক্‌হ এবং উসূলে ফিকহের কোন কিতাবে এমন ব্যাখ্যা নেই। তার অভিযোগ যে, এভাবে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে জামাআত প্রেরণ করা, মুসলমানদের মধ্যে তাবলীগ করা তো নবী যুগে ছিল না এখন তা কোত্থেকে আসল? এটা নবী-রাসূল, ওলী-আওলিয়াদের তাবলীগ নয়।

এর উত্তর হল, প্রথমতঃ একথা বলাই ঠিক নয় যে, নবীজীর যামানায় মুসলমানদের নিকট জামাআত প্রেরণ করা হতো না। দ্বিতীয়তঃ যদি মেনেও নেয়া হয় যে, নবীযুগে এ ধরনের জামাআতের কোন নমুনা পাওয়া যায় না তবুও সৎকাজের আদেশ করা, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা এই উম্মতের দায়িত্ব কর্তব্য; এই দায়িত্ব আদায়ের জন্য বৈধ (মুবাহ) কোন পদ্ধতি গ্রহণ করা হলে তাকে ভুল ও বিদআত বলার কোন অবকাশ নেই।

হাদীস ও ইসলামী ইতিহাস গ্রন্থের পাতা উল্টালে এমন অগণিত ঘটনা পাওয়া যায় যাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের কাছে সাহাবায়ে কেরামের জামাআত পাঠিয়েছেন। আর একথা স্পষ্ট যে, এসকল জামাআত প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের পরিপূর্ণ দীনের উপর ওঠানো। কালিমার দাওয়াত দেয়া নয়। নিম্নে একটি ঘটনা উল্লেখ করা হল,

আবূ আব্দুল্লাহ হাকেম, আসেম ইবনে ওমর ইবনে কাতাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, জাদীলার দুই গোত্র আদল ও কারাহ-এর কতিপয় লোক উহুদ যুদ্ধের পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলো এবং আবেদন করলো, আমাদের এলাকায় লোকজন ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাই আপনার কয়েকজন সাহাবীকে আমাদের কুরআন ও দীন শিক্ষাদানের জন্য প্রেরণ করুন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারসাদ বিন আবূ মারসাদ এর নেতৃত্বে ছয়জনের একটি জামাআত প্রেরণ করেন। (মুসতাদরাকে হাকেম; হা.নং ৪৯৭৯)

এমনিভাবে সাহাবাগণের যুগেও এ ধরনের অনেক জামাআত বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের কাছে পাঠানো হয়েছে। হযরত উমর রাযি. তাঁর খেলাফতকালে মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান ও ধর্মীয় জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতা দূরীকরণের লক্ষ্যে অনেক জামাআত পাঠিয়েছিলেন। যেমন তিনি সিরিয়ার মুসলমানদের কুরআন ও দীন শিক্ষা দেয়ার জন্য তিনজন সাহাবীকে পাঠান এবং তারা তাদের দীন শিক্ষা দিয়ে অন্য জায়গায় শিক্ষাদানের জন্য চলে যান। (তারীখে সাগীর ১/২৮১)

সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাগণের যুগে এই নিয়মে তাবলীগী কার্যক্রমের কোন নমুনা নেই বলে অহেতুক দাবী করা মূলতঃ হাদীস ও সীরাত সম্পর্কে অজ্ঞতা ও মুর্খতার বহিঃপ্রকাশ।

কথিত খতীব সাহেবের দাবী অনুসারে মুসলমানদের মাঝে তাবলীগ করা নাজায়েয হলে, যে সকল মুসলমান ঈমান-আকীদাসহ জরুরী ইবাদত-বন্দেগী ও শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে উদাসীনতার সাগরে নিমজ্জিত তাদেরকে পূর্ণ দীনদার বানানোর চেষ্টা করার জন্য কি আকাশ থেকে ফেরেশতা অবতীর্ণ হবেন? না এ কাজটি ইহুদী-খ্রিস্টানদের হাতে ছেড়ে দিয়ে মুসলমানরা উরস, মীলাদ ও জশনে জুলূস এবং শিন্নী তবারক নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে?

(সূরা মায়িদা- ৬৭, সূরা আলে ইমরান- ১০৪, ১১০, মুসতাদরাকে হাকেম; হা.নং ৪৯৮৯, ত্ববাকাতে ইবনে সা'আদ ৬/৩৬৮, ৩৬৯)

মুহাম্মাদ মানিক
মানিক নগর, ঢাকা

১৭৭ প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের খতিব সাহেবের বয়ানের কিছু বিষয় বিরোধপূর্ণ মনে হচ্ছে। সঠিক সমাধান জানার জন্য তার বয়ানের সেই বিষয়গুলো আপনার সমীপে পেশ করছি। এ বিষয়ে মসজিদ কমিটি এবং মুসল্লিদের করণীয় সম্পর্কে শরয়ী সমাধান পেশ করার সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।

(ক) ই'তিকাফ হচ্ছে ১০দিন সারা রাত্র না ঘুমিয়ে জাগ্রত থেকে ইবাদত করার নাম। ই'তিকাফ মানে ঘুমানো নাকি ইবাদত করা? মূলত সঠিক কোনটি?

(খ) মুসলমান হোক বা বিধর্মী হোক মসজিদে ঘুমানো হারাম। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা যখন ই'তিকাফ করবে, ই'তিকাফ করা অবস্থায় শরীরে ক্লান্তি আসবে এবং ইবাদত করতে করতে ক্লান্তি আসবে তখন বিছানায় একটু হেলান দিয়ে বসবে, ঘুমাবে না। সামান্য একটু হেলান দিয়ে আরাম করবে। আরাম করলেও মনে মনে তাসবীহ তাহলীল করতে হবে।

নবীজীর মেয়ের জামাই অন্য দিকে চাচাত ভাই একদিন যোহর নামাযের পর মসজিদে নববীতে চিত হয়ে শুয়েছেন। চোখ বন্ধ করেননি, তাকিয়ে আছেন, তাসবীহ-তাহলীল চলছে শুধুমাত্র লম্বা হয়ে শুয়েছেন। আমার নবী সঙ্গে সঙ্গে মসজিদে নববীর ভিতরে ঢুকে হযরত আলী রাযি. এর (যেই নবী কোন দিন আদবের খেলাফ কোন কথা বলেননি) বাম কাঁধে বাম পা দিয়ে ধাক্কা দিয়াছেন। না ডেকেই বাম পা দিয়ে ধাক্কা দিয়েছেন। হযরত আলী রাযি. নবীজীর দিকে তাকিয়েছেন। নবীজী ইশারা দিলেন, বাইরে যাও, বাইরে যাও। বাইরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, নবীগো! আমাকে কেন বাইরে আসতে বললেন? নবীজী বললেন, আলী! মসজিদ বানিয়েছি আমি, নাম রেখেছেন আল্লাহ। মসজিদ শব্দের অর্থ হচ্ছে, যে জায়গায় নামাযের সময় সিজদা দেয়া হয়। সিজদা দেয়ার জায়গায় তো শোয়া যায় না। সিজদা দেয়ার জায়গায় তো ঘুমানো যায় না। তোমরা মসজিদের ভিতরে ঘুমিয়ো না। আল্লাহ তা'আলা সারা দুনিয়ার যমীনকে বিছানা স্বরূপ বানিয়ে দিয়েছেন।

(গ) মুফতী হতে হলে একাধারে পঞ্চাশ হাজার হাদীস মুখস্থ বলতে হবে। তাহলে সে মোটামুটি মুফতী হয়; পুরাপুরি না। এখনকার যুগের মুফতীদের সারা রাত্র পিটাইলেও পাঁচশ হাদিস বের হবে না; এরা বলে মুফতী!

উত্তর : (ক) 'الاعتكاف' ই'তিকাফ শব্দের আভিধানিক অর্থ-অবস্থান করা। ফিকহের পরিভাষায় ই'তিকাফ বলা হয়, পাঁচ ওয়াক্ত জামাআত হয় এমন মসজিদে ইবাদতের নিয়তে পুরুষ লোকের অবস্থান করা। মহিলার ই'তিকাফ হল, ঘরের ভিতর নিয়মিত নামায পড়ার স্থানে ইবাদতের নিয়তে অবস্থান করা। ই'তিকাফ তিন প্রকার। যথা-

১. ওয়াজিব। এটা রমাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করার মান্নত করা কিংবা সুন্নাত ই'তিকাফ শুরু করার দ্বারা ওয়াজিব হয়।

২. সুন্নাতে মুআক্কাদা আলাল কিফায়া। অর্থাৎ রমাযানের শেষ দশকে মহল্লার পাঞ্জেগানা এবং জামে মসজিদে মহল্লাবাসীর ই'তিকাফ করা। এই ই'তিকাফ যদি মহল্লার মসজিদে কোন একজন ব্যক্তিও আদায় করে, তাহলে সবার পক্ষ থেকে দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে। আর যদি কোন মসজিদে কেউই ই'তিকাফ না করে, তবে পুরো মহল্লাবাসী গুনাহগার হবে।

বি.দ্র. উপরোল্লিখিত দুই প্রকার ই'তিকাফের জন্য ই'তিকাফকারীর রোযা রাখা আবশ্যক।

৩. মুস্তাহাব বা নফল ই'তিকাফ। তথা বছরের যে কোন দিন এবং দিনের যে কোন সময়ে কিছু সময়ের জন্য মসজিদে ই'তিকাফের নিয়তে অবস্থান করা। (আততা'রীফাতুল ফিকহিয়্যা; পৃষ্ঠা ৩১)

ফিক্হ, ফাতওয়া এবং ফিকহের পরিভাষার কিতাবসমূহে ই'তিকাফের ব্যাখ্যা এমনটিই বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে আপনাদের খতীব সাহেবের বর্ণিত সংজ্ঞা কুরআন, হাদীস এবং ফিকহের গ্রহণযোগ্য কোন কিতাবে নেই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ এবং উম্মতের মহান ইমামগণের কারো থেকেই এমন বর্ণনা পাওয়া যায় না যে, তারা ই'তিকাফকারীর জন্য ঘুমকে নিষিদ্ধ করেছেন। কিংবা তারা দশদিন ই'তিকাফ করেছেন, তার মধ্যে ঘুমের প্রয়োজন হওয়া সত্ত্বেও ঘুমাননি। তবে ই'তিকাফ অবস্থায় তাঁরা যথাসম্ভব বেশি সময় ইবাদতে মশগুল থাকতেন এটা অনস্বীকার্য। তাছাড়া ই'তিকাফ ও তার নিয়ম-নীতি তো নতুন কিছু নয়। উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে ধারাবাহিকভাবে চলে আসা একটি আমল। ই'তিকাফে ঘুমানো যাবে না, এমন কথা তো এ যাবৎ কোন সুস্থলোক বলেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

(আততা'রীফাতুল ফিকহিয়্যা; পৃষ্ঠা ৩১, আততা'রীফাত; পৃষ্ঠা ৩৪, ৩৫, আলফিকহুল হানাফী ফী সাওবিহিল জাদীদ ১/৪৩০, ৪৩১, ফাতাওয়া শামী ২/৪৪০, আলবাহরুর রায়িক ২/৩২৩)

(খ) 'মুসলমান হোক বা বিধর্মী হোক মসজিদে ঘুমানো হারাম' কথাটি সঠিক নয়। কেননা যদি মুসলমানদের জন্যেও ঢালাওভাবে মসজিদে ঘুমানো হারাম হতো, তাহলে আসহাবে সুফ্ফা তথা ঐ সকল সাহাবী যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে ইলমে দীন অর্জন করার জন্য নিজেদের পুরো সময়কে ওয়াকফ করে দিয়েছেন (এমন সাহাবীর সংখ্যা সত্তরেরও অধিক ছিলো) তারা দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা মসজিদেই অবস্থান করতেন। তাদের আবাসস্থলই ছিলো মসজিদ। মসজিদেই তারা ঘুমাতেন এবং মসজিদেই পানাহার করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে মসজিদে ঘুমাতে নিষেধ করেছেন, হাদীসের বিশাল ভাণ্ডারে কোথাও এর প্রমাণ নেই। আর এমনটি বলারও সুযোগ নেই যে, তারা ঘুমের সময় বাড়ি গিয়ে ঘুমাতেন। কেননা আসহাবে সুফফা তো ঐ সকল সাহাবী, যাদের অনেকের বাড়ি-ঘরও ছিল না।

দ্বিতীয়তঃ হযরত আলী রাযি.-এর মসজিদে নববীতে শোয়ার যে ঘটনা খতীব সাহেব বর্ণনা করেছেন তাতে তিনি মারাত্মক জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছেন। অথচ বাস্তব ঘটনা যা সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীস এবং ইতিহাসের কিতাবে পাওয়া যায় তা এই–

একদা হযরত আলী রাযি. এবং রাসূল তনয়া হযরত ফাতিমা রাযি. এর মাঝে ঘরোয়া কোন বিষয়ে মনোমালিন্য হলে হযরত আলী রাযি. অসন্তুষ্ট অবস্থায় ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে নববীতে গিয়ে শুয়ে পড়েন। সামান্য পরেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিমা রাযি. এর ঘরে আগমন করে বিষয়টি আঁচ করতে পেরে 'তোমার স্বামী আলী কোথায়?' না বলে 'তোমার চাচাতো ভাই কোথায়?' বলে ফাতিমা রাযি. এর কাছে জানতে চাইলেন। উত্তরে ফাতিমা রাযি. জানালেন, একটি বিষয়ে আমাদের মাঝে বাদানুবাদ হয়েছে। এতে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেছেন। এখন মসজিদে আছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক সাহাবীকে তাকে খুঁজতে পাঠালেন। সাহাবী এসে রাসূলকে জানালেন তিনি এখন মসজিদে শুয়ে আছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে এসে তাকে শোয়া অবস্থায় পেলেন। এ সময় হযরত আলী রা.এর গায়ের চাদর পার্শ্বদেশ থেকে সরে যাবার ফলে শরীরে মাটি লেগে ছিলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার শরীরে লেগে থাকা মাটি নিজ হাতে ঝাড়তে লাগলেন। আর আলীকে সম্বোধন করে বললেন, ওঠো হে আবূ তোরাব! (মাটির বাবা) ওঠো হে আবূ তোরাব! (সহীহ বুখারী [ইসলামিক ফাউন্ডেশন]; হা.নং ৫৮৪৫)

ঘটনার বাস্তবতা এ পর্যন্তই শেষ। মুহাদ্দিসীনের বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা দ্বারা উক্ত হাদীস থেকে মসজিদে ঘুমানের বিষয়টি প্রমাণিত হয়। কারণ ইমাম বুখারী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বুখারীর باب القائلة في المسجد তথা মসজিদে কাইলূলা করা (দুপুরে ঘুমানো) এর অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। সহীহ বুখারীর বিশিষ্ট ব্যাখ্যাগ্রন্থ উমদাতুল ক্বারী খণ্ড ৪ পৃষ্ঠা ১৯৯ এবং ইরশাদুস সারী খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৪৩৮ এবং অন্যান্য ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহে উক্ত হাদীস দ্বারা মসজিদে ঘুমানো বৈধ হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে।

কিন্তু খতীব সাহেবের বর্ণিত ঘটনা তিনি কোত্থেকে আবিষ্কার করেছেন আমাদের জানা নেই। বহু তালাশের পরও আমরা এর সত্যতার কোন প্রমাণ পাইনি। তা সত্ত্বেও তিনি যদি মনে করেন, বর্ণিত ঘটনার কোন গ্রহণযোগ্য সূত্র তার কাছে রয়েছে তবে আমাদেরকে জানিয়ে বাধিত করার অনুরোধ রইলো।

(সহীহ বুখারী; হা.নং ৬২৮০, সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৪০৯, উমদাতুল কারী ৪/১৯৯, ইরশাদুস সারী ১/৪৩৮, ফাতাওয়া শামী ৪/৪৪৯)

(গ) যে সকল কিতাবে উসূলে ফিকহের পরিভাষা বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে মুফতীর পরিচয় এভাবে দেয়া হয়েছে,

المفتي: هو الفقيه الذي يجيب في الحوادث والنوازل وله ملكة الاستنباط.

অর্থ : মুফতী বলা হয় ফিকহ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ আলেমকে যিনি নব সংঘটিত সমস্যার ইসলামী সমাধান পেশ করে থাকেন এবং যে ক্ষেত্রে সরাসরি কোন সমাধান পাওয়া যায় না, সেক্ষেত্রে নুসূসে শরইয়্যা থেকে মাসআলার সমাধান বের করার যোগ্যতা রাখেন। (আততা'রীফাতুল ফিকহিয়্যা; পৃষ্ঠা ২১২)

সুতরাং প্রশ্নোল্লিখিত মুফতীর সংজ্ঞায় খতীব সাহেব ব্যক্তিগত আক্রোশের প্রকাশ ঘটিয়েছেন বলেই প্রতীয়মান হয়। এছাড়া তার কথা অনুযায়ী বর্তমানে যদি কোন মুফতী না থাকে তাহলে এ যুগের সাধারণ মুসলমানগণ দীনী সমস্যার সমাধান পাবেন কোথায়? তারা কি নিজেরাই ফাতওয়া দেয়া শুরু করবেন? নাকি কথিত খতীবের মত মূর্খ ও স্বেচ্ছাচারী লোকের অনুসরণ করবেন? যার ব্যাপারে গভীর সংশয় আছে যে, তিনি একজন মানসিক রোগী। দীন ও শরীয়ত সম্পর্কে কোন ধরনের দায়িত্বজ্ঞান তার নেই। যখন যা মনে চায় তাই বলে বেড়ায়।

(আততা'রীফাতুল ফিকহিয়্যা; পৃষ্ঠা ২১২, আলমউসূআতুল ফিকহিয়্যা আলকুওয়াইতিয়্যা ২০/৩২, আদাবুল মুফতী ওয়ালমুসতাফতী ১/২৩)

সংশ্লিষ্ট মসজিদের কর্তৃপক্ষ ও মুসল্লীদের জরুরী দায়িত্ব হল, এমন ভারসাম্যহীন লোককে অব্যাহতি দিয়ে বিজ্ঞ আলেমগণের পরামর্শক্রমে কোন পরহেযগার ও যোগ্য আলেমে দীনকে ইমাম ও খতীব পদে নিয়োগ দেয়া।

মুহাম্মদ জসিমুদ্দিন
মুহাম্মাদিয়া হাউজিং লিমিটেড

১৭৮ প্রশ্ন : (ক) পালকপুত্র নেয়া যাবে কিনা?

(খ) পালকপুত্র নেয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রী রাজী কিন্তু স্বামী রাজী না। এক্ষেত্রে উক্ত পালকপুত্র নেয়ার হুকুম কী?

উত্তর : (ক) শরীয়ত মতে পালকপুত্র কোন পুত্র নয়। লালন-পালনকারীর সাথে তার কোন বংশসূত্র স্থাপিত হবে না। তাকে তার জন্মদাতা পিতার পরিচয়েই পরিচিত করতে হবে। পালক সন্তান ছেলে হলে পালনকারীনী মহীলার সাথে বিবাহ বৈধ। বালেগ হয়ে গেলে পালকপুত্রের সাথে তার পর্দা করা ফরয। আর পালক সন্তান মেয়ে হলে পালনকারীর সাথে বিবাহ বৈধ এবং পর্দা করা ফরয। পালক সন্তান মাহরাম হতে পারে না। হ্যাঁ, দুগ্ধ সম্পর্ক স্থাপিত হলে পর্দা ও বিবাহের হুকুম পরিবর্তন হবে। কিন্তু মীরাস কখনো পাবে না।

পুত্র বা কন্যা বানানোর উদ্দেশ্য না রেখে যদি কেউ কোন সন্তান অথবা ইয়াতীমের লালন-পালন করে, তবে সে বিরাট সওয়াবের অধিকারী হবে।

(খ) প্রশ্নে বর্ণিত সূরতে অন্যের সন্তান পালনের দায়িত্ব নেয়া জায়েয হবে না। কেননা স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন রাজী না থাকলে উক্ত শিশুর লালন-পালন কষ্টকর হয়ে যাবে। যদ্দরুণ সে অবহেলিত হয়ে পড়বে এবং পারিবারিক অস্বস্তি সৃষ্টিরও প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

(সূরা আহযাব- ৪, ৫, সহীহ বুখারী; হা.নং ৪৭৮২, ৬০০৫, তাফসীরে ইবনে কাসীর ৬/৪০১, ফাতাওয়া শামী ৩/৪৯৩, আলমউসূআতুল ফিকহিয়্যা আলকুওয়াইতিয়্যা ১০/১২২, তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন ৭/৮৫)

মুহাম্মাদ হাসিবুর রহমান
স্টেশন রোড, রাজবাড়ী

১৭৯ প্রশ্ন : ইহরাম অবস্থায় ফরয গোসলের তারতীব কি? আমি শুনেছি ইহরাম অবস্থায় শরীর পরিস্কার করে গোসল করা যায় না। অথচ ফরয গোসলের সময় শরীর ভাল করে পরিস্কার করতে হয়। এছাড়া চুল ও দাড়ির গোড়ায় পানি পৌঁছাতে গেলে কিছু চুল ও দাড়ি পড়ার আশঙ্কা থাকে। সেক্ষেত্রে করণীয় কি?

উযূর সময় মাথা মাসাহ্ করতে গেলে আমার মাথা থেকে কিছু চুল পড়ে যায় এবং দাড়ি খুব কোঁকড়ানো হওয়ায় দাড়ি খিলাল করতে গেলে মাঝে মধ্যে দাড়িও পড়ে যায়। ইহরাম অবস্থায় সেক্ষেত্রে করণীয় কি?

ইহরাম বাঁধার আগে মাথা মুণ্ডালে কোন সমস্যা আছে কি?

উত্তর : ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধিযুক্ত সাবান ব্যবহার না করে গোসল করতে হবে। ঘষে-মেজে শরীরের স্বাভাবিক ময়লা পরিস্কার করা যাবে না। অবশ্য নাপাকী (বীর্য) বা পেশাব-পায়খানা লেগে গেলে তা অবশ্যই পরিষ্কার করতে হবে। এতে কোন প্রকার দম আসবে না।

আর চুল ও দাড়ির গোড়ায় পানি পৌঁছাতে গিয়ে অথবা উযূতে মাথা মাসাহ ও দাড়ি খিলাল করতে গিয়ে যদি তিনটি বা তার চেয়ে কম সংখ্যখ চুল-দাড়ি পড়ে যায় তাহলে সবগুলোর জন্য এক মুঠ গম বা তার সমপরিমাণ মূল্য সদকা করে দিবে। আর যদি তিনটির বেশি পড়ে যায় তাহলে সদকায়ে ফিতর পরিমাণ টাকা সদকা করে দিবে।

আর ইহরাম বাঁধার আগে মাথা মুণ্ডালে কোন সমস্যা নেই। বিশেষ করে ওযর বশত করলে কোন সমস্যা না হওয়া আরো যুক্তিসঙ্গত।

(মানাসিকে মোল্লা আলী কারী; পৃষ্ঠা ১২২, গুনইয়াতুন নাসিক; পৃষ্ঠা ২৫৬-২৫৮, ফাতাওয়া শামী ২/৫৫৩, যুবদাতুল মানাসিক; পৃষ্ঠা ৩৬৮)

আব্দুল কাইয়ূম আল মাসউদ
শ্রীপুর, গাজীপুর

১৮০ প্রশ্ন : একই মসজিদে জুমু'আর দ্বিতীয় জামাআত এবং একই ঈদগাহে ঈদের দ্বিতীয় জামাআত করা যাবে কিনা? স্থান সংকুলান না হওয়ায় অথবা অন্য কোন কারণে যারা জুম'আর জামাআতে কিংবা ঈদের জামাআতে শরীক হতে পারবে না, তাদের করণীয় কি?

উত্তর : একই মসজিদে জুম'আর দ্বিতীয় জামাআত করা মাকরূহ। যেমনিভাবে অন্যান্য নামাযের ক্ষেত্রে একই মসজিদে দ্বিতীয় জামাআত করা মাকরূহ। অনুরূপভাবে একই ঈদগাহে দ্বিতীয় জামাআত করাও মাকরূহ।

সুতরাং মসজিদে স্থান সংকুলান না হওয়ায় অথবা অন্য কোন কারণে যাদের পক্ষে জুম'আর নামাযে শরীক হওয়া সম্ভব হবে না তারা পার্শ্ববর্তী এমন কোন মসজিদে জুম'আর নামায আদায় করে নিবে যেখানে জুম'আর নামায সহীহ হয়। তা সম্ভব না হলে তারা জামাআত না করে একাকী যোহর পড়ে নিবে।

অনুরূপভাবে ঈদগাহে ও তার আশপাশ মিলেও যদি মুসল্লীদের জায়গা সংকুলান না হয় তাহলে অবশিষ্ট মুসল্লীগণ পার্শ্ববতী কোন মসজিদে বা ঈদগাহে গিয়ে নামায আদায় করে নিবে যেখানে ঈদের নামায সহীহ হয়। এমনিভাবে কোন হলরুম বা খালি ময়দানেও পড়া যায়, যেখানে সবার প্রবেশাধিকার আছে।

পাশাপাশি এলাকাবাসীর কর্তব্য হল তারা মসজিদ ও ঈদগাহের পরিধি বৃদ্ধি করার ব্যাপারে সচেষ্ট হবেন। কোন ক্রমেও যদি বিকল্প ব্যবস্থা করা সম্ভব না হয় এবং মসজিদ ও ঈদগাহের পরিধিও সংকীর্ণ হয়, কেবলমাত্র এরূপ ক্ষেত্রে একই মসজিদে কিংবা একই ঈদগাহে ভিন্ন ইমামের পিছনে দ্বিতীয় জামাআত করার অবকাশ রয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় ইমাম প্রথম ইমামের জায়গা ছেড়ে পিছনে কিংবা ডানে-বামে সরে দাঁড়ালে উত্তম হবে।

(মু'জামুত ত্ববারানী আউসাত; হা.নং ৪৬০১, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ৬০০২, ফাতাওয়া শামী ১/১১৩, ৫৫৩, ২/১৫৭, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ৫/৮১, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/১২৫, ইমদাদুল আহকাম ১/৭৪৩, দীনী মাসাইল আওর উনকা হল; পৃষ্ঠা ৯৫)

মুহাম্মদ রাহাত কবির
বসতি হাউজিং, মিরপুর, ঢাকা

১৮১ প্রশ্ন : (ক) জন্মবার্ষিকী, মৃত্যুবার্ষিকী, কুলখানি, চল্লিশা ইত্যাদির জন্য কেউ যদি দাওয়াত দেয় তাহলে করণীয় কি? এসব উপলক্ষে মসজিদে ইমাম সাহেবকে নামাযের পর দু'আ করানো হয় এবং মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। এ ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কি?

(খ) খতনার জন্য কেউ দাওয়াত দিলে করণীয় কি?

(গ) ফেইসবুক, টুইটার, স্কাইপি ইত্যাদি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং সর্বোপরি ইন্টারনেটে ব্যবহারের ক্ষেত্রে

মুফতী মনসূরুল হক দা.বা. এর ফতওয়া বা মতামত কি?

(ঘ) ইসলামী আলোচনা, মাহফিল, ফতওয়া, তিলাওয়াত এসবের ভিডিও দেখার ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কি?

(ঙ) দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কাজের সুন্নাতসমূহ দলীল বা হাদীসসহ কোন কিতাবে একত্রে পাওয়া যাবে? দাড়ি টুপি ও ইসলামী লেবাস সংক্রান্ত একটি নির্ভরযোগ্য বাংলা কিতাবের নাম জানতে চাই।

উত্তর : (ক) জন্মবার্ষিকী, মৃত্যুবার্ষিকী, কুলখানী, চল্লিশা পালন করা বিদআত এবং অমুসলিমদের আবিষ্কৃত কুপ্রথা। ইসলামী শরীয়তে এগুলোর কোন ভিত্তি নেই। কাজেই বিদআত কাজের জন্য কেউ দাওয়াত দিলে তাতে অংশগ্রহণ করা মোটেও উচিত নয় এবং এসব উপলক্ষে মিষ্টান্ন বিতরণ করাও বিদআত কাজের অংশ হিসেবে নাজায়েয। এসব কুসংস্কার পালন না করে সুবিধানুযায়ী বছরের যে কোন সময় দান-সদকা, তিলাওয়াত, তাসবীহ, গরীব মিসকীনদেরকে খানা খাওয়ানো ইত্যাদির মাধ্যমে ঈসালে সওয়াব করা যায়। বিদআতমুক্ত ঈসালে সওয়াবের অনুষ্ঠানে দাওয়াত গ্রহণ করাও জায়েয আছে। হ্যাঁ কোন ইমাম সাহেবের দাওয়াত গ্রহণ না করার মধ্যে ফিতনার আশঙ্কা হলে ফিতনা থেকে বাঁচার স্বার্থে অংশগ্রহণের অনুমতি আছে। শর্ত হল, সুযোগ বুঝে এ বিদআত সম্পর্কে সমাজের লোকদেরকে ও সংশ্লিষ্ট লোককে বুঝাতে থাকতে হবে।

(ফাতাওয়া শামী ২/২৪০, আলফিকহুল ইসলামী ওয়াআদিল্লাতুহু ২/১৫৭৮, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/৪৬, ৭৪, ইমদাদুল আহকাম ১/২০৬)

(খ) খতনা করা সুন্নাত এবং শিআরে ইসলাম। কিন্তু এ উপলক্ষে খতনার দিন লোকজন দাওয়াত করা বিদআত ও সুন্নাত পরিপন্থী কাজ। হযরত হাসান রাযি. থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি হযরত উসমান ইবনে আবুল আস রাযি. কে খতনা উপলক্ষে দাওয়াত দিলে তিনি তাতে শরীক হতে অস্বীকৃতি জানান। কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় কখনো খতনা অনুষ্ঠানে যেতাম না। (মুসনাদে আহমদ; হা.নং ১৭৯০৮)

সুতরাং কেউ দাওয়াত দিলে তাতে শরীক হওয়া অনুচিত। তবে খতনাকৃত শিশু সুস্থ হওয়ার পর শরীয়তের গণ্ডির মধ্যে থেকে সাধ্য অনুযায়ী শুকরিয়া স্বরূপ কেউ দাওয়াত দিলে তাতে শরীক হওয়ার অবকাশ আছে। কিন্তু এই দাওয়াত করাকে কিছুতেই জরুরী মনে করা যাবে না।

(মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ১৭৯০৮, ইমদাদুল মুফতীন ২/১৮৬, কিফায়াতুল মুফতী ২/২৯৩-২৯৬, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/৭২)

(গ) ফেইসবুক, টুইটার, স্কাইপি ইত্যাদি এগুলো একদিকে যেমন যোগাযোগ-মাধ্যম, অপরদিকে গুনাহ ও নাফরমানীতে লিপ্ত হওয়ার বিরাট উপকরণ। বর্তমানে এগুলোর মাধ্যমে নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী তরুণ-তরুণীদের মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক, কথাবার্তা, পরকীয়ায় লিপ্ত হয়ে সুখের সংসার জাহান্নামে পরিণত হওয়া, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটা, নগ্ন ছবি দেখাসহ এত বেশি গুনাহের ছড়াছড়ি হয় যা জাতির জন্য ধ্বংস ও চরম বিপর্যয়ের কারণ। তাই এগুলোর ব্যবহার শরীয়ত মতে নাজায়েয। আর ইন্টারনেটের মাধ্যমে যেহেতু দীনী ও জরুরী কাজও নেয়া যায়, তাই এর বিধান ব্যবহারকারীর উপর নির্ভরশীল। কারো যদি ব্যবহার করতে গিয়ে গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা না থাকে তাহলে তার জন্য ব্যবহার করার অবকাশ আছে; অন্যথায় নয়।

(সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৭, মুআত্তা ইমাম মালেক; হা.নং ৯৪৯, আলআশবাহ ওয়াননাযাইর; পৃষ্ঠা ৩৪, মুহাক্কাক ওয়া মুদাল্লাল জাদীদ মাসাইল; পৃষ্ঠা ৪৭৯)

(ঘ) কোন প্রাণীর ছবি হাতে আঁকা কিংবা শরীয়ত স্বীকৃত প্রয়োজন ছাড়া ক্যামেরার মাধ্যমে ছবি তোলা এবং তা সংরক্ষণ করা যেমন নাজায়েয ও মারাত্মক গুনাহের কাজ, তেমনি কোন প্রাণীর ভিডিও করা, সংরক্ষণ করা এবং দেখা সবই নাজায়েয ও গুনাহের কাজ। কাজেই শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া ইসলামী আলোচনা, মাহফিল ইত্যাদির ভিডিও করা, সংরক্ষণ করা, দেখা সবই নাজায়েয চাই তা যত বড় দীনী কাজই হোক না কেন।

(সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৯৫০, ৫৯৫১, ফাতাওয়া শামী ৫/২৩৩, আলআশবাহ ওয়াননাযাইর; পৃষ্ঠা ৩৪)

(ঙ) আপনি মুফতী মনসূরুল হক সাহেবের 'কিতাবুস সুন্নাহ', অধ্যক্ষ মুহাম্মদ মিজানুর রহমান সাহেবের 'নেসাবে তালীমুস সুন্নাহ', 'দাড়ি ও আম্বিয়া কেরামের সুন্নাত'-মূল মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরী, মাওলানা জুনাইদ বাবুনগরী সাহেবের 'ইসলামে দাড়ির বিধান' এবং মুফতী মীযান সাহেবের 'আহকামে লেবাস' কিতাবগুলো দেখতে পারেন।

নার্গিস বেগম
রায়ের বাজার, হাজারীবাগ, ঢাকা

১৮২ প্রশ্ন : (ক) পুরুষ-মহিলা উভয়ের জন্য আংটি ব্যবহার করার হুকুম কি?

(খ) আংটি কোন হাতের কোন আঙ্গুলে পরতে হয়?

(গ) কা'বা ঘরের ভিতরে পাওয়া পাথর বরকত হিসেবে আমি আমার আংটিতে লাগাতে চাই, শরীয়তে এর অনুমতি আছে কি?

উত্তর : (ক) মহিলাদের জন্য আংটি ব্যবহার করা সর্বাবস্থায় বৈধ। চাই তা স্বর্ণের হোক বা রৌপ্যের, চার মাশার কম হোক বা বেশি। এটা তাদের অলঙ্কার হিসেবে গণ্য হবে। তবে লোহা, তামা, পিতল এবং সীসার আংটি ব্যবহার করা মহিলাদের জন্যও মাকরূহ। আর পুরুষদের জন্য আংটির ব্যবহার বৈধ হতে হলে শর্ত হল, আংটির রিং রৌপ্যের হতে হবে, স্বর্ণের বা অন্য কোন ধাতুর না হতে হবে। পরিমাণে চার মাশা তথা সিকি তোলার চেয়ে কম হতে হবে এবং মহিলাদের আংটির আকৃতিতে না হতে হবে। তবে ইসলামী ফিকহবিদগণ লিখেছেন যে, পুরুষদের জন্য আংটি ব্যবহার না করাই উত্তম।

(আলমউসূআতুল ফিকহিয়্যা আলকুওয়াইতিয়্যা ১১/২৩-২৪, ফাতাওয়া শামী ৬/৩৬০, ৩৬১, ফাতাওয়া আলমগীরী ৫/৩৮৮-৩৮৯, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১৬/১৭৬)

(খ) মহিলাদের জন্য যে কোন হাত বা পায়ের যে কোন আঙ্গুলে আংটি পরা বৈধ। তবে বাম হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে পরা উত্তম। আর পুরুষদের জন্য ডান বা বাম হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে পরা উত্তম।

(আলমউসূআতুল ফিকহিয়্যা আলকুওয়াইতিয়্যা ১১/২৬, ফাতাওয়া আলমগীরী ৫/৩৮৯)

(গ) হ্যাঁ, কা'বা ঘরের ভিতর থেকে পাওয়া পাথর আপনার আংটির পাথর হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। শরীয়তে এর অনুমতি আছে। কিন্তু পাথরটি কা'বা ঘর থেকে প্রাপ্ত বিষয়টি নিশ্চিত না হয়ে এমন কথা বলা বা বিশ্বাস করা উচিত নয়। কারণ কা'বার ভিতরে আংটির পাথর পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই দুরূহ।

(সহীহ মুসলিম; হা.নং ২০৮৯, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৪২১৬, ৪২২৩, ফাতাওয়া শামী ৬/৩৬০, ফাতাওয়া আলমগীরী ৫/৩৮৯)

ইকবাল হুসাইন
পূর্ব গোড়ান, ঢাকা

১৮৩ প্রশ্ন : আমাদের মসজিদ তিন তলা বিশিষ্ট। জুমু'আ ও তারাবীহ নামাযে ইমাম ও হাফেয সাহেবগণ দোতলায় দাঁড়ান। এ বছর নিচতলার পুরো অংশে মহিলাদের জন্য তারাবীহতে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মসজিদে মহিলাদের প্রবেশ ও বহিঃগমনের রাস্তা পুরুষদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পর্দার খেলাফ হওয়ার কোন সুযোগ নেই। এমতাবস্থায় মহিলাগণ তারাবীহ বা জুমু'আর জামাআতে অংশগ্রহণ করতে পারবে কিনা? শরীয়তের দলীলসহ জানতে চাই।

উত্তর : বিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য সকল উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে বর্তমান ফিতনার যামানায় মহিলাদের জন্য মসজিদে উপস্থিত হওয়া নিষেধ। আমাদের তুলনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় পর্দার আরো উত্তম ব্যবস্থা ছিল এবং সেই যামানার পুরুষ-মহিলাগণও আমাদের চেয়ে হাজার গুণ বেশি পরহেযগার ছিলেন। তবুও বহু হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তারা ঘরেই নামায পড়বে; এটাই তাদের জন্য সর্বোত্তম স্থান। কোন একটি হাদীসেও মহিলাদেরকে মসজিদে আসতে উৎসাহিত করা হয়নি। বরং হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, রাসূলের ইন্তিকালের পর মহিলারা যেরূপ সাজ-সজ্জা শুরু করেছে তা যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতেন, তাহলে অবশ্যই তাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করে দিতেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৮৬৯)

সুতরাং বর্তমানে যে আরো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। অতএব মহিলাদের জন্য তারাবীহ বা জুমু'আর জামাআতে অংশগ্রহণ করতে মসজিদে আসা শরীয়ত মতে জায়েয নয়।

তাছাড়া পর্দা রক্ষা করে মহিলাদেরকে মসজিদের নিচতলায় জায়গা দিয়ে মুসল্লীসহ ইমাম সাহেব দ্বিতীয় তলায় দাঁড়ালে যদিও ইকতিদা সহীহ হয়ে যাবে, কিন্তু এমন পন্থা অবলম্বন করা মসজিদের মূল ভিত্তি ও উম্মতের মুতাওয়ারাস আমল তথা পূর্ব থেকে হয়ে আসা আমল পরিপন্থী। তাই এমন পন্থা অবলম্বন করা থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

(সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৫৬৬, সহীহ বুখারী; হা.নং ৮৬৯, মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ৫৪৬৭, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ৭৭০২, ফাতাওয়া শামী ১/৫৬৬, আলফিকহুল ইসলামী ওয়াআদিল্লাতুহ ৭/৫২৫৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৮৭, আহসানুল ফাতাওয়া ৩/২৮৬)

শাব্বীর বিন আব্দুল হাই

১৮৪ প্রশ্ন : আমার বোনের চারটি সন্তান সিজারে হয়েছে। চতুর্থ সিজাদের সময় ডাক্তার বলেছিল লাইগেশন করে নিতে। কারণ পঞ্চম সিজার অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। বর্তমানে আমার বোন ছয় মাসের অন্তঃসত্তা। খুব অসুস্থ; মানসিকভাবেও, শারীরিকভাবেও। তাছাড়া ডাক্তাররা লাইগেশন না করলে পঞ্চম সিজার করবেনই না। এমতাবস্থায় আমাদের কি করণীয়? লাইগেশন করা যাবে কিনা? বিস্তারিত দলীলসহ জানালে উপকৃত হব।
উল্লেখ্য, একাধিক সিজাদের পর সাধারণত নরমালে সন্তান প্রসব হয় না।

উত্তর : সন্তান ধারণ ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলার একটি অনেক বড় নিয়ামত। একটি বড় সৃষ্টি। এর মাধ্যমে তিনি পৃথিবীতে মানব সৃষ্টির ধারা অব্যহত রেখেছেন। সুতরাং কঠিন ওযর ছাড়া স্থায়ীভাবে তা বন্ধ করে দেয়া মানে সৃষ্টিগত যোগ্যতাকে পরিবর্তন করে দেয়া। যা সম্পূর্ণ নাজায়েয। তবে প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী আপনার বোনের বর্তমান যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, এমতাবস্থায় ইসলামী শরীয়ত মতে তার জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা নেয়া বৈধ হবে।

(সূরা নিসা- ১১৯, সূরা বাকারা- ২৮৬, সহীহ বুখারী; হা.নং ৫০৭১, ৫০৭৩, ফাতাওয়া শামী ৩/১৭৬, আলমউসূআতুল ফিকহিয়্যা আলকুওয়াইতিয়্যা ৪০/২৬২, আলআশবাহ ওয়াননাযাইর; পৃষ্ঠা ৯৩, ইমদাদুল মুফতীন; পৃষ্ঠা ৮০৯)

মুহাম্মাদ হাসিব

১৮৫ প্রশ্ন : (ক) হজ্জে যে দু'আগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত সেগুলো কি কি?

(খ) হজ্জের সফরে মুসাফির হব নাকি মুকীম?

(গ) বদলী হজ্জ আদায়কারীর নিজর ওয়াজিব কুরবানীর হুকুম কি?

উত্তর : (ক) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হজ্জের বিভিন্ন দু'আ নিম্নোক্ত বইগুলো থেকে পড়ে নিতে পারেন-

১. কিতাবুল হজ্জ (মুফতী মনসূরুল হক)
২. মাসায়িলে হজ্জ ও উমরা (মুফতী মুহাম্মাদ খাইরুল্লাহ)
৩. হজ্জ ও উমরাহ্ ও মসজিদে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যিয়ারতের নির্দেশিকা (প্রকাশনায়, ইসলামী দাওয়াত, এরশাদ, আওকাফ ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়)

উল্লেখ্য, উপরোল্লিখিত ৩নং বইটির মধ্যে অনেক এমন দু'আও রয়েছে যা হাদীসে বর্ণিত দু'আ নয়। সুন্নাত মনে না করে ঐ সকল দু'আ পড়া যেতে পারে।

(খ) কোন ব্যক্তি ৪৮ মাইল বা তার চেয়ে দূরে কোথাও গিয়ে নির্দিষ্ট কোন শহর বা গ্রামে ১৫ দিন বা তার চেয়ে বেশি দিন থাকার নিয়ত করলে শরীয়তের দৃষ্টিতে সে মুকীম হিসেবে গণ্য হবে। আর ১৫ দিনের চেয়ে কম দিন থাকার নিয়ত করলে সে মুসাফির হিসেবে গণ্য হবে।

বর্তমানে মক্কা, মিনা ও মুযদালিফা প্রত্যেকটির নাম ভিন্ন ভিন্ন হলেও কোন কোন দিক থেকে মক্কার বসতির সাথে এগুলোর বসতি মিলে যাওয়ার কারণে শরীয়তের দৃষ্টিতে সবগুলো মিলে একটি শহর। সুতরাং আপনি যদি এ সকল স্থানে হজ্জের আগে পরে বা হজ্জের সময় মিলে সামষ্টিকভাবে মোট ১৫ দিন বা তার বেশি দিন থাকার নিয়ত করেন, তাহলে আপনি সেখানে অবস্থানের দিনগুলোতে মুকীম হবেন এবং পূর্ণ নামায আদায় করবেন। আর যদি এ সকল স্থানে সামষ্টিকভাবে মোট ১৫ দিনের চেয়ে কম থাকার নিয়ত করেন তাহলে আপনি মুসাফির হবেন এবং একাকী বা শুধু মুসাফিরগণ নামায পড়লে কসর পড়বেন।

(হাশিয়াতু ইবনে আবিদীন ২/৫১৫, ফাতাওয়া শামী ২/৫৩৮, ইমদাদুল ফাতাওয়া ২/১৬৫)

(গ) বদলী হজ্জ আদায়কারী যদি ১০ই যিলহজ্জ সুবহে সাদিক থেকে ১২ই যিলহজ্জ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত (২নং প্রশ্নের উত্তরে বর্ণিত ব্যাখ্যা অনুযায়ী) সম্পূর্ণ সময় মুসাফির থাকে তাহলে তার উপর ঈদুল আযহার কুরবানী করা ওয়াজিব নয়। আর যদি তিনি উক্ত সময়ে মুকীম থাকেন তাহলে হজ্জের কুরবানী ছাড়াও ঈদুল আযহার জন্য ভিন্ন কুরবানী করতে হবে। ঈদুল আযহার কুরবানী মক্কা বা মিনাতেও করতে পারে কিংবা দেশের বাড়িতেও করাতে পারে।

(হাশিয়াতু ইবনে আবিদীন ২/১২১, আলবাহরুর রায়িক ২/২২৫, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৭৩)

হজ্জ সম্পর্কিত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাসাইল

প্রকাশনা বিভাগ, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা

এটি বিশিষ্ট মুফতীগণের উপস্থিতিতে ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে বসুন্ধরা ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারে অনুষ্ঠিত একটি ফিকহী সেমিনারের সিদ্ধান্তাবলী সম্বলিত প্রচারপত্রের হুবহু মুদ্রণ।

হজ্জ ও উমরা আদায়কারীগণ বিভিন্ন জরুরী মাসাইল সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অনবগতির কারণে ভুল-ভ্রান্তির শিকার হয়ে থাকে। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য গত ১লা মে ৯৪ইং রোজ রবিবার ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বসুন্ধরা ঢাকায় বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় দারুল ইফতার প্রধান মুফতী ও ইফতা বোর্ডের চেয়ারম্যান মুফতী আব্দুর রহমান সাহেবের সভাপতিত্বে বাংলাদেশের খ্যাতনামা মুফতিয়ানে কেরামের একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে দীর্ঘ আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়। সর্বসাধারণের উপকারার্থে সিদ্ধান্তসমূহ প্রচারের বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করা হয়।

মাসআলা : ১

মিনা, মুযদালিফা ও আরাফায় সউদী সরকার কর্তৃক নিয়োজিত ইমাম যদি মুকীম হওয়া সত্ত্বেও নামায কসর করেন (চার রাকাতের স্থলে দুই রাকাত পড়ান) তাহলে ঐ ইমামের পিছনে ইকতিদা দুরস্ত হয় না। পক্ষান্তরে ইমাম মুসাফির না মুকীম তা জানা সাধারণের পক্ষে দুষ্কর। তাই হাজী সাহেবগণ নিজ নিজ স্থানে চার রাকাত বিশিষ্ট নামায নির্ধারিত সময়েই আদায় করে নিবে। মুসাফির হলে চার রাকাতের স্থলে দুই রাকাত আদায় করবে। অবশ্য কোন মুসাফির মুকীমের পিছনে ইকতিদা করলে ইমামের অনুসরণে চার রাকাতই আদায় করবে।

মাসআলা : ২

ক্বিরান ও তামাত্তু হজ্জ আদায়কারীদের জন্য দমে শোকরের জন্তু জবাই করার পর হলক করা ওয়াজিব। এর ব্যতিক্রম করে জবাইয়ের পূর্বে হলক করলে জরিমানা স্বরূপ অন্য আর একটি দম তার উপর ওয়াজিব হয়ে যায়। আর ব্যাংকে টাকা জমা দিয়ে জবাইয়ের পূর্ণ দায়িত্ব তাদের উপর অর্পণ করা হলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে। তাছাড়া ব্যাংকের দ্বারা কুরবানী করানো সুন্নাতের পরিপন্থী। তাই ব্যাংকে টাকা জমা না দিয়ে নিজ হাতে বা কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির মাধ্যমে জবাইয়ের কাজ সম্পন্ন করার পর হলক করবে।

মাসআলা : ৩

হারাম শরীফে নামাযের কাতারে মহিলারা পুরুষের পার্শ্বে বা সোজা সামনের কাতারে দাঁড়িয়ে যায়। এমতাবস্থায় মহিলার দুই পার্শ্বের দুই পুরুষ এবং সোজা পিছনের পুরুষের নামায নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান। তাই নিজ নিজ নামাযের হিফাযতের জন্য দুই পার্শ্বের সংলগ্ন পুরুষগণ কাতার সোজা রাখার চিন্তা না করে এক বিঘত পরিমাণ সামনে এগিয়ে দাঁড়াবে এবং মহিলার সোজা পিছনের পুরুষ সরে গিয়ে এমনভাবে দাঁড়াবে যাতে করে সোজা সম্মুখে মহিলা না হয়। যদি নামায শুরু করার পর মহিলা এসে পাশে বা সামনে দাঁড়াতে চায় তাহলে ইশারার মাধ্যমে বারণ করার চেষ্টা করলে পুরুষের নামায নষ্ট হবে না।

মাসআলা : ৪

রমাযান মাসে বিতরের নামায জামাআতের সহিত আদায় করতে হয়। কিন্তু যে ইমাম দুই সালামের দ্বারা বিতর নামায পড়ান তার পিছনে ইকতিদা করা দুরস্ত নয়। বিধায় নিজেরা জামাআতের সহিত (ওযর সাপেক্ষে একাকী) বিতর আদায় করে নিবে।

উপরোল্লিখিত মাসাইল সম্পর্কে ইফতা বোর্ডের পক্ষে সিদ্ধান্ত দানকারী মুফতীয়ানে কেরাম-

১. মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব, সভাপতি, বাংলাদেশ ইফতা বোর্ড।
২. মুফতী কেফায়াতুল্লাহ সাহেব, মুফতী হাটহাজারী মাদরাসা।
৩. মুফতী ইসহাক সাহেব, মুফতী ও শাইখুল হাদীস, জিরি মাদরাসা।
৪. মুফতী ফজলুল হক আমীনী সাহেব, লালবাগ মাদরাসা।
৫. মুফতী মনসূরুল হক সাহেব, মুফতী, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া।
৬. মুফতী নূরুল ইসলাম সাহেব, মুফতী, ওলামাবাজার মাদরাসা ফেনী।
৭. মুফতী ওয়াক্কাস সাহেব, শাইখুল হাদীস, স্টেশন মাদরাসা যশোর।
৮. মুফতী হাবীবুর রহমান সাহেব, মালিবাগ মাদরাসা।
৯. মুফতী সাঈদ আহমাদ সাহেব, নানুপুর মাদরাসা চট্টগ্রাম।
১০. মুফতী মীযানুর রহমান সাহেব, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বসুন্ধরা।
১১. মুফতী নজরুল ইসলাম সাহেব, আমলাপাড়া মাদরাসা নারায়ণগঞ্জ।
১২. মুফতী হাবীবুর রহমান সাহেব, ফুলগাজী মাদরাসা ফেনী।
১৩. মুফতী মুসাদ্দেক সাহেব, মুজাহেরুল উলূম মাদরাসা চট্টগ্রাম।
১৪. মুফতী আবূ সাঈদ সাহেব, মুফতী, ফরিদাবাদ মাদরাসা।

(৪ পৃষ্ঠার পর : দা'য়ীর সাথে)

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস তখনই করবেন যখন আমরা দাওয়াতের কাজে অবতীর্ণ হবো।

দাওয়াতের এই মেহনতে তোমাদের আরো কর্মঠ-উদ্যমী হতে হবে। এখন যৌবনের তেজ আছে। আয়ুষ্কাল অনেক সংক্ষিপ্ত। বয়স হয়ে গেলে এই তেজ আর উদ্দীপনা থাকবে না। শারীরিক শক্তি তখন অল্পতেই তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। পুরাতন গাড়ি কিছুক্ষণ চলতেই ইঞ্জিন গরম হয়ে যায়। তখন গাড়ি থামিয়ে ইঞ্জিন ঠাণ্ডা করে আবার চালাতে হয়। তেমনি মানুষের বয়স হয়ে গেলে অল্প মেহনতেই কাহিল-ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তখন আর মেহনত করার সুযোগ থাকে না। সুতরাং এখনই তোমাদের সময়। অলসতা না করে এই যৌবনের সময়টুকু গনীমত মনে করে যত বেশি সম্ভব কাজে লাগাও। মসজিদ-মাদরাসার দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি এই তিন দাওয়াতে যথাসম্ভব বেশি বেশি মেহনত করো।

তবে এসব দাওয়াতকে ফলপ্রসূ করার জন্য প্রথম শর্ত হলো নিজের তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধি করা। কারণ, তাযকিয়া ছাড়া দা'য়ীর কথায় তাসীর বা প্রভাব থাকে না। সেটা কেবলই চাপাবাজি আর গলাবাজি হয়। এজন্য তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির জন্য কোন হক্কানী আল্লাহওয়ালার কাছে নিজেকে মিটানো যারপরনাই জরুরী। এই শর্তগুলোর সাথে তিন ধরনের দাওয়াতে নিজেদের নিয়োজিত করলে সকল চক্রান্তের মোকাবেলায় আল্লাহ তা'আলা আমাদের হয়ে যাবেন এবং তিনিই সমস্ত ষড়যন্ত্র ধ্বংস করে দিবেন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে, তোমাদেরকে এবং সকলকে দাওয়াত-তা'লীম-তাযকিয়ার সকল ক্ষেত্রে সহীহ মেহনত করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

অনুলিখন : মাওলানা সা'দ আরাফাত
শিক্ষক, জামি'আ ইসলামিয়া চরওয়াশপুর, হাজারীবাগ, ঢাকা।

কিশোর প্রতিভা

আমরা কেউ ভালো নেই- কেউ না

বুধবার। মার্চের শেষভাগ, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ। বাসায় ছোট্ট পরিসরে এক আনন্দ আয়োজন। আনন্দের কোন শেষ নেই। সবার মাঝেই খুশির আভা ঝিলমিলিয়ে উঠছে। পিচ্চিদের ছোটাছুটি, চিৎকার চেঁচামেচি আর সীমাহীন আনন্দের মাঝ দিয়েই সকাল পেরিয়ে দুপুর চলে এলো। খুব মজা করে খাওয়া-দাওয়াও শেষ হল। গ্রাম থেকে হঠাৎ খালামনির ফোন– নানুর অবস্থা মোটেই ভালো না। আর বার বার শুধু আম্মুকে খুঁজছে। আম্মুতো শুনেই অস্থির। থেমে থেমে কান্নাও শুরু করে দিয়েছেন। কাঁদো কাঁদো হয়ে আমাদেরকে বললেন, তোরা সবাই দু'আ করতে থাক, আল্লাহ যেন তোদের নানুকে সুস্থ করে দেন। সংবাদটি আমাদের মন ভীষণ খারাপ করে দিল। আমরা সবাই অজানা ভয়ে আতঙ্কিত– নানু সুস্থ হবেন তো। তৎক্ষণাৎ নানুকে দেখতে আব্বু আর আম্মু চলে গেলেন গাজীপুর কাপাসিয়ায়। আম্মুকে দেখে কষ্টের মাঝেও তিনি অনেক খুশি হলেন।

তিনদিন পর গ্রাম থেকে আবারো খালামনির ফোন– তোরা যদি নানুকে দেখতে চাস, তাহলে জলদি চলে আয়। তিনি যে এখন মৃতপ্রায়।

অস্থির হয়ে এবার সকলেই নানুবাড়ি ছুটে গেলাম। কাঁপা কাঁপা পায়ে নানুর ঘরে ঢুকলাম। খালামনি আর মামীরা তখন নীরবে কাঁদছেন। ভয়ে ভয়ে নানুর দিকে তাকালাম। দেখলাম, নানু চোখ বুজে বিছানায় পড়ে আছেন। কোল বালিশে হাত-পাগুলো অবশ লেপ্টে আছে। নড়াচড়া নেই। নিথর দেহ। ফ্যাল ফ্যাল নয়নে একবার শুধু দেখলেন কিছুই বলতে পারলেন না। কেমন আছিস, কখন এলি– কিছুই না। দেখে আমার খুব কষ্ট হল। হাউমাউ করে কাঁদতে ইচ্ছা হল। কষ্ট করে ওড়নার আঁচলে মুখ ঢেকে কান্না থামালাম।

আহ! আজ নানুর এতোটা কষ্ট! অথচ এইতো সেদিন নানু কতোটা সুস্থ। আমরা এলে কত্তো খুশি হতেন। শতটা বায়না পূরণ করেও ক্লান্ত হতেন না। রাত জেগে কত্তোসব গল্প বলতেন। তবে এখন বেঁচে থেকেও শুধু এক নিথর দেহ, জীবন্ত লাশ। ফ্যাল ফ্যাল নয়নে চেয়ে থাকা অশীতিপর অক্ষম এক বৃদ্ধা।

আজ অনেক দিন। এখনো নানু বেঁচে আছেন। বেঁচে না থাকা মানুষের মত। এখনো নানুর সকাল হয় দিন শেষে সন্ধ্যা নামে। সে সকাল তোমাদের মতো সুখী আলো ঝলমল নয়; সে এক ভীষণ কষ্টের, ভয়াবহ অন্ধকার ভোর। যেখানে ক্ষণে ক্ষণে নির্দয় কষ্টরা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। এখন শুধুই মৃত্যু ও মৃত্যুর যাতনা। আর বেঁচে থেকেও অসহ্য যন্ত্রণা। প্রিয়তম নানুর এমন হলে আমরা কেমন থাকি বলো? খোদার কসম বলছি, আমরা কেউ ভালো নেই– কে-উ না।

-তোমরা আমার নানুর জন্য দু'আ করো।

আমাতুর রব তাশফিয়া

স্বপ্নধারা হাউজিং, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

এখনো মনে পড়ে

৩০ মার্চ বুধবার। সারাদিন কেন যেন মনটা খারাপ হয়ে আছে। আব্বু-আম্মুর কথা বড্ড মনে পড়ছে। আজকের দিনটাও কেমন মন খারাপ করা ভাব। বিকেল থেকেই আকাশটা যেন মুখ ভার করে আছে। গোধূলির আবির মাখা রঙ ছড়িয়ে পড়তে না পড়তেই শুরু হল আকাশের অঝোর কান্না। কী জানি, আমার মত ওর মনটাও কেন আজ এতো খারাপ!

মাগরিবের পর কিতাব নিয়ে বসেছি। কিছুক্ষণ পর আর ভালো লাগছে না। বারান্দায় গিয়ে খোলা আকাশের দিকে মুখ করে দাঁড়ালাম। সবেমাত্র আকাশের কান্না থেমেছে। রাতের আকাশের স্নিগ্ধ পরশ ঝিরঝিরে বাতাসে মনটাও উদাস হয়ে যাচ্ছে। সময় তখন রাত ৮টা। সহপাঠী মাহমূদকে দেখি দ্রুতবেগে সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠছেন। সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই বলল, মুহাম্মাদ আলী সাহেব হুযূরের পিতা ইন্তিকাল করেছেন।

সত্যি বলতে এ সংবাদটি শুনতে আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল তিনি আর নেই। ছলছল চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি আকাশে কোন তারা জ্বলছে না। কিন্তু আমার হৃদয়াকাশে জ্বলছিল মিটিমিটি তারকারাজি। সেই তারকারাজির মাঝে বারবার ভেসে উঠছিল সেই শুভ্র নির্মল চেহারার ভদ্র সজ্জন এক মুরুব্বীর ছবি। স্মৃতির আয়নায় যিনি আজো আমার আকাশে তারাগুলোর মতোই জ্বলজ্বলে। তিনি ছিলেন একজন নীরব শান্ত প্রকৃতির সাধারণের মাঝে অসাধারণ। তার সাথে আমার পরিচয়ের সূত্রটাও ছিল অন্য রকম। সেদিনের ঘটনাটা আজো আমায় নাড়া দেয়। দেহ মন আন্দোলিত করে। তিনদিন পর ঈদুল আযহা। এমন একদিন বাদ আসর তা'লীমের পর মাইক হাতে দাঁড়িয়ে বললেন, ভাইসব! আমি আপনাদের সামনে কয়টা কথা বলবার চাই। আমরা একে অপরের দিকে তাকালাম। মনে মনে ভাবলাম, কে এই বুড়ো মানুষটি? তিনি বলে চললেন, 'ভাইয়েরা! কয়েকদিন পর আপনাদের মাদরাসা ছুটি হইব। আপনারা বাড়িতে যাইবেন। আপনাদের কাছে আমার একটি আরয হইল, আপনারা হিন্দুদের দোকানের মিষ্টি খাইবেন না। কারণ ওরা মিষ্টিতে গরুর পেশাব মিশাইয়া দেয়। যেমনভাবে ইহুদী-নাসারারা কোকা-কোলা, পেপসিতে শুকুরের চর্বি মিশিয়ে দেয়। আর এতে ওদের কোন সমস্য নেই। সমস্য হইলো আমাদের আপনাদের। তাই এই গুলো থেকে আমাদের বাইচা থাকতে হইবো।'

মুরুব্বীর কথাগুলো শুনে বড় আশ্চার্যান্বিত হলাম। উদগ্রীব হলাম তার পরিচয় পেতে। শুনলাম ইনি আমাদের প্রিয় উস্তাদ মুহাম্মাদ আলী হুযূরের পিতা। মনে মনে ভাবলাম, এমন সচেতন ও জনদরদী পিতার সন্তানই কেবল হযরত মুহাম্মাদ আলী কাসেমীর ন্যায় সবার প্রতি নির্মল মহব্বত ও বে-নযীর খায়েরখাহীর অধিকারী হতে পারে।

অনেকের মত আমিও তার সঙ্গে দেখা করলাম। বুঝলাম, ইনি মিশুক প্রকৃতির এক মজার মানুষ। আমাদের সঙ্গে আপনি করে কথা বলেন। মাঝে-মধ্যে উর্দূও বলেন। কখনো নিজের কথা বলেন আর কখনো দেশ ও জাতির কথা বলেন। কথা প্রসঙ্গে একদিন মজাক করে বললেন, রিযিকের মালিক তো আল্লাহ তা'আলা। তাই বলি কী, আপনারা হুযূররা বেশি বেশি বিয়া করেন। এতে যেমন ফ্যাতনা-ফ্যাসাদ কমবো, তেমনি কিছু অসহায় নারীরও মাথা গোঁজার ঠাই মিলবো। আর সমাজে একাধিক বিয়ার

প্রতি মানুষের যে বিরূপ মনোভাব সেটাও আস্তে আস্তে দূর হইবো।

মুরুব্বীর এ ধরনের গুরুগম্ভীর কথা শুনে আমি তাজ্জব বনে যেতাম। একজন সাধারণ মানুষ এমন অসাধারণ কথা কীভাবে বলে? এরপর অনেকদিন দেখা নেই। শুনলাম অসুস্থাবস্থায় বাড়ি আছেন। খতমে খাযেগানে ধারাবাহিক দু'আ চলছিল। একদিন দেখি তিনি মসজিদের কোণে বসে আছেন। অন্যান্য ভাইয়েরা দেখা করছেন। আমি এগিয়ে গেলাম। বড় আন্তরিকভাবে সবার সঙ্গে সালাম মুসাফাহা করছেন আর দু'আ নিচ্ছেন। বলছেন, ভাই! দু'আ কইরেন। শরীরটা ভালো না। খাবার খাইতে পারি না। অনেক মায়া লাগলো। মনের কোথায় যেন চিনচিন করে উঠল। সান্ত্বনামূলক কিছু কথা বলে দু'আ পড়লাম– اسئل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك। তখন থেকে এ পর্যন্ত অসুস্থই ছিলেন। তবে যখনই একটু ভালো লাগতো, মাদরাসায় ছুটে আসতেন। ছাত্র-উস্তাদদের সঙ্গে মোলাকাত করতেন। আর বলতেন, দু'আ কইরেন যেন ঈমান নিয়া যাইতে পারি।

আশা করি আল্লাহ তা'আলা মুরুব্বীর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছেন। কেননা মৃত্যুর পূর্ব ও পরে তিনি উলামাগণের পাশে ও সাথেই ছিলেন। আলেম-উলামা ও তুলাবাদের সঙ্গে ছিল তার অকৃত্রিম মহব্বত। যার ফলে মৃত্যু পরবর্তী গোসল, কাফন-দাফনসহ সকল কাজ উলামাদের মোবারক হাতেই সম্পন্ন হয়েছে। আর জানাযা! সে তো বড় দিলকাশ মানযার! রাত ১০.৪৫ মিনিট। মনে হল জামি'আর মাঠে নূরের ঢেউ তরঙ্গায়িত হচ্ছে। নূর আর নূর। অনেক ঈর্ষা হয়েছিল এ দৃশ্য দেখে। শতশত আলেম-তালিবে ইলমের অংশগ্রহণে জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়। আর ইমামতি করেন স্বয়ং বাংলার অবিসংবাদিত আলেমে দীন মুফতী সাহেব দা.বা.। আহ! কত বড় ভাগ্যবান মানুষ! এমন আবেগ মিশ্রিত, কান্না বিজড়িত জানাযা খুব কম মানুষের ভাগ্যে নসীব হয়। দু'আ করি আল্লাহ তা'আলা তার কবরকে সুশীতল ও শান্তিময় করে দেন। জান্নাতী উলামাদের সঙ্গে হাশর নসীব করেন এবং সুউচ্চ ফিরদাউসে স্থায়ী ঠিকানা দান করেন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

آسمان انکی لحد پر شبنم افشانی کرے،
سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔

আকাশ যেন তার সমাধিতে শিশির বর্ষণ করে,
আর সবুজ গালিচা যেন এ ঘরকে 'সযত্ন আবরণ' দান করে।

মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

তার সান্নিধ্যে কিছুক্ষণ

আজ শুক্রবার। টানা এক সপ্তাহ ক্লাসের পর কিছুটা বিশ্রামের সুযোগ। কিন্তু কেন যেন মনে প্রশান্তি লাগছে না। অজানা কোন কারণে মন বিষণ্ণতায় ভরে গেছে। ভেবেছিলাম ঘুমিয়ে হয়ত ভেলে যাবো দুঃখ-বেদনা, কিন্তু কিছুই হয়নি।

আসর নামাযের পর হাঁটতে বের হলাম। যদি বিকালের স্নিগ্ধতায় কিঞ্চিত শান্ত হয় হৃদয়, স্থির হয় অন্তর, সঞ্চয় হয় নব উদ্যম। কিন্তু চিন্তা-ভাবনা সবই অবান্তর; ভগ্ন হৃদয়ে আদায় করলাম মাগরিবের নামায। নামাযের পর এক ভাই এসে বলল, হুযূরের বাসায় যেতে হবে।

গিয়ে দেখি হুযূরের আব্বা এসেছেন। বয়সের ভারে ন্যুব্জ এক অশীতিপর বৃদ্ধ। যার বাম পাশ অবশ। তাই ধরে ধরে উপরে উঠাতে হবে। চেয়ারে বসিয়ে ধরে উপরে নিয়ে গেলাম। আল্লাহ তা'আলার এই মুখলিস বান্দা নিচতলা থেকে তিনতলায় উঠাতে কতবার যে 'জাযাকাল্লাহ' বলেছেন আল্লাহই ভালো জানেন। তারপর উযূ করালাম। তিনি তার ফ্যাল ফ্যাল নয়নে আমার অন্তরে এক অসম্ভব রকম মহব্বতের বীজ বপন করে দিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কোন কিতাব পড়? বললাম, মীযান। তিনি একটি মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, 'মা-শা-আল্লাহ'। তার 'মা-শা-আল্লাহ' আমার কাছে স্বর্গীয় মনে হল। যা সমস্ত ক্লান্তির অবসাদ ঘটিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছে এক নব উদ্যম, শান্ত করেছে অশান্ত হৃদয়কে, সতেজ করেছে ক্লান্ত-শ্রান্ত দেহটাকে। তারপর সালাম জানিয়ে প্রফুল্ল চিত্তে ফিরে এলাম মাদরাসায়। ইচ্ছা ছিল এমন উপকারীর সাথে দ্বিতীয়বার দেখা করে তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করব। কিন্তু... পরদিন তিনি নিজ বাসস্থানে ফিরে গেলেন। অপূর্ণ রয়ে গেল দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের আশা। তবে ফের সেই পরম সাক্ষাতের আশায় এখনো প্রহর গুণি।

শু'আইব আহমাদ
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

পুষ্পোদ্যানে মধু আহরণে

বহতা নদীর মত তরতরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে আমার জীবন থেকে 'শিক্ষাজীবন' নামের সেই ছোট্ট 'জীবন তরী'। যার গতি রোধ করার মত কিছু আবিষ্কার হয়নি এখনো। এ যেন বিরামহীন গতিতে ধাবমান এক তরী। শত ঘাত-প্রতিঘাত ও বাধা-বিঘ্নতার মাঝেও থেমে যায় না ওর গতি। চলে আপন শক্তিতে, ছুটে যায় আপন গন্তব্যপানে।

কতটুকু এগিয়ে গেল এ যাবতকাল ধরে, কতটুকু দূরে আছে তার সীমানা কোল থেকে; এটা নয় তার মূল লক্ষ্য, নয় এ চলমান তরীর আসল উদ্দেশ্য। মূলত দেখার বিষয় হল, কে কতটুকু পেল এ সময়ের মাঝে, কতটুকু পাথেয় জোগাল এ তরীতে আরোহন কালে, অপূর্ণ পাত্রটি কতটুকুই বা পূর্ণ হল জ্ঞান-গরিমা ও হিকমতের সমন্বয়ে! (?)

দিনের পর দিন এসে সপ্তাহ কেটে যায়। মাস পেরিয়ে এক সময় বছর অতিক্রান্ত হয়। এরই মাঝে হারিয়ে যায় জীবনের সুন্দর দিনগুলো। মুছে যায় কষ্টে পার হওয়া সময়ের না ভোলা স্মৃতিগুলো। সময়ের এই উত্থান-পতনের মধ্য দিয়েই পৌঁছে গেছি আজ শিক্ষা জীবনের দ্বারপ্রান্তে।

দাওরা হাদীসের প্রথম দিন। এ দিনটির জন্য বিগত দীর্ঘ নয় বছরের চেষ্টা-কোশেশ। নাহু, সরফ, বালাগাত ও ফাসাহাতের দুর্গম গিরিপথ ও আদবের অসমতল ধু-ধু মরুপ্রান্তর খোদায়ী মদদে পাড়ি দিয়ে এসেছি আজ হাদীসের পুষ্পোদ্যানে নববী মধু আহরণে। যে পুষ্পের সৌরভে আজ সুরভিত পুরো দুনিয়া। মন মাতানো গন্ধে সুবাসিত ইলমী জগতের প্রতিটা কোণা, প্রতিটা মুমিনের অন্তরে আছে এই মধুর মিষ্টতা, আছে মধু আহরণের তীব্র আগ্রহ ও সুপ্ত মনোবাসনা। তাই তো ছুটে আসে নানা প্রান্ত থেকে এই লালিত আগ্রহকে পুঁজি করে একঝাঁক মৌমাছি রাহমানিয়ার ছাউনিতলে। বছর জুড়ে মধু নিয়ে তারা ফিরে যায় উম্মাহর পানে, দুঃস্থ মানবতার সেবায় ও ক্ষতিগ্রস্ত ঈমানের ক্ষতির মাশুল বোঝাতে।

মাওলা তুমি তাওফীক দিও
এগিয়ে যেতে সম্মুখে,
বাড়িয়ে দিও হিম্মত মোদের
তোমারই নামের বরকতে।
তুমিই মহান, হে রাহীম রহমান।
বঞ্চিত করো না মোদের
এ মধু সংগ্রহ থেকে।

নাজমুল হাসান বিন ইউসুফ (খুলনা)
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা